রমণীর মন

মেনীর মন

শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী

ত্রিবেণী প্রকাশন
প্রাইভেট লিমিটেড
২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রথম সংস্করণ শ্রাবণ ১৩৬৭

প্রকাশক
কানাইলাল সরকার
২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা—১২

মুদ্রক
ভোলানাথ হাজরা
রূপবাণী প্রেস
৩১, বাদুড় বাগান স্ট্রীট,
কলিকাতা—৯

প্রচ্ছদ
দীপ্তেন বসু

ব্লক
স্ট্যাণ্ডার্ড ফটো এনগ্রেভিং কোং লিঃ

প্রচ্ছদ মুদ্রণ
চয়নিকা প্রেস

বাঁধাই
ইণ্ডিয়ান বুক বাইণ্ডিং কোং

দাম : তিনটাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা

উৎসর্গ

শচীন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়
প্রীতিভাজনেষু

এই লেখকের

বন্ধনী

আকাশ ও মৃত্তিকা

পান্থনিবাস

ঘরের ঠিকানা

বসন্ত রজনী

নতুন ফসলঃ

ময়ূরাক্ষী

গৃহকপোতী

সোমলতা

শতাব্দীর অভিশাপ

কালোঘোড়া

ক্ষুধা

শৃঙ্খল

মনের গহনে

হংস বলাকা

মধুচক্র

বহ্ন্যুৎসব

মহাকাল

কৃশানু

স্তূপ

তিমির বলয় (১ম ও ২য় পর্ব)

নীলাঞ্জন

শ্রেষ্ঠ গল্প

মধুমিতা

শুক্লসন্ধ্যা

সূচী

রমণীর মন	...	১
যখন বৃষ্টি নামল	...	৮
মানুষের মানে	...	১৮
মরা কাঠগোলাপ	...	২৫
রুকমিনি	...	৩৭
জ্যাক ও জীপ	...	৪৭
ভৈরবী	...	৫৭
কেন	...	৭১
বলদেব রায়	...	৮০

॥ রমণীর মন ॥

পাঞ্জাব মেল আসানসোল স্টেশনে যখন থামল, তাতে তিল ধরবার জায়গা নেই। সুরেশ্বর মিথ্যে ছুটোছুটি করতে লাগল। তৃতীয় এবং মধ্যম শ্রেণীর যাত্রীরা হাঁফাচ্ছে। যারা বসে আছে তাদের অবস্থাও যেমন, যারা দাঁড়িয়ে আছে তাদেরও তেমনি।

তখন ভোর হতে দু-তিন ঘণ্টা দেরি। অনিদ্রায় এবং সারারাত্রির ধকলে সবাই ধুঁকছে। চোখ ছোট হয়ে এসেছে। গাড়ির দরজা পর্যন্ত লোকের ঠাসাঠাসি।

সুরেশ্বর করুণ কণ্ঠে আবেদন জানাল: আমাকে একটু ঢুকতে দিন। এ গাড়িতে না যেতে পারলে আমার সর্বনাশ হয়ে যাবে।

কিন্তু সে আবেদন কারও কানে গেল বলে মনে হল না। অধিকাংশই নির্বিকার। নিজেকে সামলাতেই ব্যস্ত। অন্যের সর্বনাশের কথাও ভাববার সময় নেই। যাদের কানে আবেদন পৌছল, তারা সর্বনাশের কথাটা বিশ্বাসই করলে না। ভিড়ের সময় ট্রেনে ওঠবার জন্যে অনেকেই অনেক সর্বনাশের দোহাই দেয়। তাদের অধিকাংশই মুখ ফিরিয়ে হাসল। কেউ বা না-শোনার ভান করল। কেউ বা মুখ ফুটেই মন্তব্য করল: এত যদি তাড়া, আগের ট্রেনে যান নি কেন? সুরেশ্বর তারও হয়তো একটা জবাব দিলে, কিন্তু সে কেউ শুনলে বলে মনে হল না।

অবশ্য সকলেই কিছু নির্মম লোক নয়। যাদের কিছু দয়া-মায়া আছে, সুরেশ্বরের আবেদনের উত্তরে তারাও করুণভাবে হাত জোড় করে জানালে, দরজাটা যে খুলি এমন জায়গাও খালি নেই।

কথাটা সত্যি। এবং সুরেশ্বরের সর্বনাশের কথাটাও মিথ্যে নয়। সুরেশ্বর তখন মরিয়া। প্রথম অথবা দ্বিতীয় শ্রেণীতে ওঠা ছাড়া তার উপায় নেই। কিন্তু সেখানেই বা প্রবেশের পথ কোথায়? উচ্চশ্রেণীর যাত্রীরা ভিতর থেকে দরজা-জানলা বন্ধ করে সুখসুপ্ত।

সুরেশ্বর কয়েকটা দরজাতেই জোরে জোরে ধাক্কা দিলে, কিন্তু কেউ সাড়া দিলে না। হতাশভাবে ফিরে এসে আবার একটা দরজায় ধাক্কা দিতে মনে হল

কে যেন দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। একটা জানলার খড়খড়ি যেন নেমে গেল।

—কে? কী চান?

রমণীর কণ্ঠস্বর।

সুরেশ্বর জানলার সামনে এসে দাঁড়াল। সকাতরে বললে, আমি অত্যন্ত বিপন্ন। এ গাড়িতে না যেতে পারলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। একটুখানি জায়গা চাই।

মহিলাটি নিঃশব্দে ওর দিকে চেয়ে রইল। জিজ্ঞাসা করলে, কত দূর যাবেন?

ব্যগ্রভাবে সুরেশ্বর উত্তর দিলে, কলকাতা। মানে হাওড়া।

—সঙ্গে আর কেউ আছে?

—আজ্ঞে না, আমি একলা।

সুরেশ্বর অস্থির হয়ে উঠেছে। ট্রেন ছাড়তে আর দেরি নেই। এক্ষুনি গার্ড হুইস্‌ল্ দেবে এবং মেল ট্রেন সঙ্গে সঙ্গে ছুটতে আরম্ভ করবে। তার সমস্ত দেহ চঞ্চল। যেন এক জায়গায় দাঁড়িয়েই ছুটছে।

মহিলাটি আরও কয়েক মুহূর্ত নিঃশব্দে তার দিকে চেয়ে রইল। সুরেশ্বরের চঞ্চল কাতর দৃষ্টি একবার গার্ডের গাড়ির দিকে, একবার ড্রাইভারের এঞ্জিনের দিকে এবং আর-একবার মহিলাটির দিকে ছুটোছুটি করছে।

মহিলাটি কী যেন ভাবলে। তারপরে দরজাটা খুলে দিলে। সঙ্গে সঙ্গে সুরেশ্বর বিদ্যুৎবেগে ভিতরে ঢুকে পড়ল।

দুশ্চিন্তা এবং উদ্বেগে এই ভোরেও সুরেশ্বর ঘেমে উঠেছিল। বেঞ্চে বসে রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছে এতক্ষণে সে ঘরের চারিদিকে দেখবার অবসর পেল।

যে বেঞ্চে সে বসেছে সেই বেঞ্চে একটি বছর ষোল-সতেরোর ছেলে। ফরসা রঙ। ছিপছিপে লম্বা চেহারা। পরিধানে চমৎকার স্যুট। দিব্যি স্মার্ট দেখতে।

ওদিকের বেঞ্চে আর একটি ছেলে। বছর এগারো-বারো বয়স হতে পারে। সেটিও স্যুট-পরা। দাদার মতই সুন্দর দেখতে। মায়ের গা ঘেঁষে বসে একদৃষ্টে আগন্তুকের দিকে চেয়ে আছে। তার চোখে কিছুটা কৌতূহল, কিছুটা বিস্ময়, কিছুটা বিরক্তি।

তারপরে মহিলাটি।

তার দিকে চেয়ে সুরেশ্বর থমকে গেল।

মহিলাটি অপলক তার দিকে চেয়ে রয়েছে। কৌতুকে চোখের তারা দুটি নাচছে। চোখের তারা সকল মেয়ের নাচে না। তার জন্য চাই সূক্ষ্মাগ্র তির্যক ভ্রূ, দীর্ঘ পক্ষ্ম এবং আবেশ-বিহ্বল টানা চোখ।

সুরেশ্বর অনেক মেয়ে দেখেছে। কৌতুকে চোখের তারা কারও নাচত না। বাদে একজন। কিন্তু—

মহিলাটির ঠোঁটের কোণে রহস্যময় হাসি না?

সুরেশ্বর এবারে লাফিয়ে উঠল: অমিতা না?

—চিনতে পেরেছ?

—না পারারই কথা। আজকের ব্যাপার তো নয়!

সুরেশ্বরের মুখে এবং কণ্ঠস্বরে অনেকখানি খুশি এবং অনেকখানি লজ্জা খেলে বেড়াতে লাগল।

অমিতা বললে, তোমার গলার স্বর শুনেই তোমাকে চিনেছি। দরজা খুলে দেখি, মূর্তিমান তুমি। কিন্তু তোমার তখন কারও দিকে দৃষ্টি দেবার সময় নয়। একটু বসতে পেলে বাঁচ।

লজ্জিত কণ্ঠে সুরেশ্বর বললে, যা বলেছ! কোথাও এক ফোঁটা জায়গা নেই। অথচ—

—অথচ বিপদটা কী!

সুরেশ্বরের মুখ হঠাৎ করুণ হয়ে গেল। বললে, আমার মেজ ছেলেটি—তাকে বোধ হয় দেখ নি, যক্ষ্মা-হাসপাতালে। রাত বারোটায় টেলিগ্রাম পেলাম, তার অবস্থা ভালো নয়।

—ও।

সমবেদনায় অমিতার মুখও বিষণ্ণ হয়ে উঠল।

বললে, সুনীতিদিকে আনলে না?

—সে তো নেই। সে তো অনেকদিন হল নেই।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ।

—কী হয়েছিল?

সুরেশ্বরের মুখের উপর একটা কালো ছায়া পেলে গেল, যেটা অমিতার ভালো লাগল না। প্রসঙ্গটাকে এড়াবার জন্যে বললে, সে অনেক কথা অমিতা। আবার যদি কখনও দেখা হয় বলব।

ওর মনের ভাব অমিতা বুঝলে। একে সে অনেক দুঃখের বিনিময়ে খুব ভালো করেই চিনেছে। সুতরাং কিছুটা অনুমানও করতে পারলে। জেদ না করে তাই সে চুপ করে রইল।

একটু পরে সুরেশ্বর জিজ্ঞাসা করলে, তুমি কোথা থেকে আসছ এখন ?

অমিতা হাসলে। বললে, অমৃতসর থেকে।

—এ দুটি ?

সুরেশ্বর ছেলে দুটির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে।

—আমার ছেলে।

উত্তর দিতে গিয়ে সুরেশ্বরের বিস্ময়-বিমূঢ় চোখের দিকে চেয়ে অমিতার গাল দুটি আরক্তিম হয়ে উঠল।

ছেলে দুটির জন্যেই সুরেশ্বর নিজেকে সামলে নিলে। সহজ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে, আর কী খবর বল ?

হেসে অমিতা জবাব দিলে, খবর তো অনেক। আবার দেখা হলে বলব।

একটু চিন্তা করে সুরেশ্বর বললে, দেখা হবে। তুমি কোথায় উঠবে ?

—প্রথমে ভেবেছিলাম, কোন একটা হোটেলে উঠব।

—তারপরে ?

—উনি বললেন, মাসখানেক থাকতে হতে পারে। তখন একটা বাড়ি ঠিক করাই ভালো। তাই থিয়েটার রোডের কাছাকাছি একটা বাড়ি ঠিক হয়েছে।

অমিতা রাস্তার নাম এবং নম্বরটা বলে জিজ্ঞাসা করলে, তুমি তো নিজের বাড়িতেই উঠবে ? কোথায় যেন সেটা

সুরেশ্বর হাসলে। অত্যন্ত ম্লান হাসি। বললে, না, সেখানে উঠব না।

—কেন ?

—সেটা বিক্রি হয়ে গেছে। সেও অনেক দিনের কথা। যাই হোক, ছেলেকে দেখে একদিন তোমার ওখানে নিশ্চয়ই যাব।

—নিশ্চয় এস। ভারি খুশী হব।

—সত্যি ?

—সত্যি।

—অণ্ডাল এসে গেল। এবারে নামতে হবে। দেখি যদি কোথাও থার্ড ক্লাসে একটা দাঁড়াবার জায়গা পাই। হাওড়া স্টেশনে আবার দেখা হবে।

অমিতা কিছু বলবার আগেই সুরেশ্বর নেমে গেল।

সুরেশ্বরের চেহারা, সাজ-পোশাক এবং কথাবার্তায় অমিতা বুঝেছিল, খুব দুঃখের মধ্যেই তার দিন কাটছে। তৃতীয় শ্রেণীতে সুরেশ্বর ভ্রমণ করতে পারে এটা অচিন্ত্যনীয়। তার কলকাতার বাড়ি বিক্রি হয়ে গেছে। আছে এখন আসানসোলের বাড়িতে। আগে বছরে ছ-মাস আসানসোলে আর ছ-মাস কলকাতার বাড়িতে থাকত।

ধনী পিতামাতার একমাত্র সন্তান সুরেশ্বর। এই অবস্থায় অতিরিক্ত আদরে যা হয় সুরেশ্বরেরও তাই হয়েছিল। তার বিলাস-ব্যসন এবং বদ্ খেয়ালের অন্ত ছিল না।

তার ঐশ্বর্যের চমকে বিভ্রান্ত হয়ে প্রথম যৌবনে অমিতা একদিন তার বদখেয়ালের স্রোতে কুটোর মত ভেসে গিয়েছিল।

কুটোর মত।

কী যে অমিতার হয়েছিল, নিজের বলে কিছুই যেন তার ছিল না। বাপ-মা, সঙ্গী-সাথী, লেখাপড়া কিছুই তাকে বাঁধতে পারে নি। সে যেন একটা নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল। সে কি ভালবাসায়, না ওর ঐশ্বর্যের চমকে, না ওর রূপে?

হ্যাঁ, রূপ বটে!

পুরুষের এত রূপ সে কখনও দেখে নি। দীর্ঘচ্ছন্দ বলিষ্ঠ চেহারা। প্রশস্ত ললাট, বড় বড় রক্তোৎপলের মত চোখ আর কাঁচা সোনার মত রঙ!

আর তেমনি অতুলনীয় অমিতব্যয়িতা। টাকা যেন হাতের ময়লা! বিন্দুমাত্র মমতা নেই তার উপর।

মমতা নেই নিজে ছাড়া আর কারও উপর, কিছুরই উপর। টাকা আসে অনাভনন্দিত, যায়ও তেমনি। মধ্যে যে আনন্দলোক সৃষ্টি হয় তার নিজের জন্যে সেইটেই বড় কথা।

নইলে একান্তভাবে তারই উপর নির্ভরশীল অসহায় কোন মেয়েকে নিশ্চিন্তে হাওড়া স্টেশনে কেউ ফেলে যেতে পারে! শুধু সুরেশ্বরই পারে।

এবং পাঞ্জাব মেল এক সময় সেই হাওড়া স্টেশনেই অমিতাদের নামিয়ে দিলে।

অমিতা চেয়ে দেখতে লাগল।

কত কাল পরে সেই হাওড়া স্টেশনে ফিরে এল সে! বড় ছেলের দিকে চেয়ে মনে-মনে হিসাব করে দেখলে আঠারো বৎসর। তখন তার বয়সও ছিল আঠারো। আজ ছত্রিশ।

কত পরিবর্তন হয়েছে হাওড়া স্টেশনের। না কি তার নিজের চোখেরই পরিবর্তন হল? আঠারো বছর বয়সের চোখ আর ছত্রিশ বছর বয়সের চোখ এক নয়। সেদিন আর এদিনও এক নয়। যেন ছুটি পৃথক জন্মের ছুটি দিন।

অমিতা চারিদিকে চেয়ে চেয়ে মনে করবার চেষ্টা করতে লাগল, ডাঃ অখিল নন্দীর সঙ্গে কোথায় দেখা হল? ওইখানে কি? যেখানে একটি বৃদ্ধ দম্পতি কতকগুলি ট্রাঙ্ক এবং বস্তা নামিয়ে কার জন্যে যেন অপেক্ষা করছেন?

হয়তো এ প্ল্যাটফর্মেই নয়। অন্য কোন প্লাটফর্মে কে জানে? আঠারো বছর আগে কোন্ একটা অজ্ঞাত ট্রেন কোন্ প্ল্যাটফর্ম থেকে ছাড়ত আজ আর কাউকে জিজ্ঞাসা করেও জানবার উপায় নেই। অখিলের নিজেরই মনে নেই খুব সম্ভব।

অথচ জানতে পারলে মনটা বড় ভালো হত। সেই জায়গাটিই তার বর্তমান জন্মের সূতিকাগার। সেইখানে নতুন করে অমিতার জন্ম হয়।

সূতিকাগার এবং সেই সঙ্গে শ্মশানও।

সেইখানে মরে গেল অমিতা মুখুয্যে। পুড়ে ছাই হয়ে গেল। জন্ম নিলে অমিতা নন্দী। ছেলে ছুটির দিকে চেয়ে তার মন যেন আরও জোর পেলে। হ্যাঁ, অমিতা নন্দী, মুখুয্যে নয়।

অথচ সে বুঝতে পারলে না, যে মেয়েটি নিজের শ্মশান নিজের চোখে দেখতে চায় সে অমিতা নন্দী নয়, মুখুয্যেই। অনেক কাল পরে তার বুকের মধ্যে আঠারো বছর বয়সের রক্ত টগবগ করে উঠেছে।

কিন্তু নিজের শ্মশান নিজের চোখে দেখার কি জো আছে! এই পৃথিবী যেন কী! নদীর স্রোতের মত, মরুভূমির মত। দাগ কেটে, চিহ্নিত করে কিছুই রেখে যাওয়া যায় না।।

—চল মা।—বড় ছেলেটি তাগাদা দিলে।

—হ্যাঁ, যাই।

অমিতার চোখ চারিদিকে কী যেন তখনও খুঁজছে।

সুরেশ্বর হন্তদন্ত হয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলে, সব নেমেছে? আর-কিছু নেই তো?

গাড়ির ভিতর উঁকি দিয়ে উপর-নীচে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখে নিয়ে সুরেশ্বর আশ্বস্তভাবে বললে, না। আর-কিছুই নেই। চল এখন। এই কুলি!

কুলির মাথায় মোট চাপিয়ে আবার বললে, চল। একটা ট্যাক্সি ডেকে দিতে হবে তো?

অমিতা তথাপি নড়ে না।

—কী খুঁজছ? কিছু হারাল নাকি?—সুরেশ্বর এবার রীতিমত তাড়া দিলে।

নিশ্চল দাঁড়িয়ে অমিতা বললে, সেই জায়গাটা খুঁজছি।

—কোন্ জায়গাটা?

—অমিতা মুখুয্যে যেখানে মারা গেল।

কথাটা বুঝতেই সুরেশ্বরের এক মিনিট গেল। এক ঝলক কালো রক্ত মুখের উপর ছড়িয়ে পড়ল।

বললে, সে কি আর মনে আছে?

ব্যগ্রভাবে অমিতা বললে, আমার মনে আছে। সে জায়গার প্রত্যেকটি বিন্দু আমার মনে গাঁথা আছে। দেখতে পেলেই চিনতে পারি।

কিন্তু চেনা দূরের কথা, কিছুই যে দ্বিতীয়বার দেখা যায় না, অমিতা মুখুয্যেকে সে কথা বোঝায় কে?

সুরেশ্বর দারুভূত। ছেলেটি অপরিচিত মহানগরীতে এসে হতভম্ব। তাড়া দিলে কুলিরা:

—চলিয়ে না। কেৎনা ঘড়ি খাড়া রহেগা?

হ্যাঁ। দাঁড়িয়ে থাকার জো নেই। চলতে হবে। ওরাও নিঃশব্দে চলতে লাগল।

যখন বৃষ্টি নামল ॥

অন্ত্রঘটিত কঠিন একটা ব্যাধি। ডাক্তারী শাস্ত্রে তার একটা মস্তবড় নামও আছে। কিন্তু তা শুনে আমাদের কোন লাভ নেই। মোট কথা বড় ডাক্তারও জবাব দিয়ে গেছেন। বাঁচবার আশা নেই। পনেরো দিন, কি বড় জোর একটা মাস। বাড়ির সকলেই প্রত্যক্ষভাবে ডাক্তারের অভিমত জেনেছে। পরোক্ষভাবে প্রমথনাথ নিজেও।

শুয়ে শুয়ে শান্তভাবে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করেন তিনি।

আর ভাবেন।

ভাবনার অনেক কিছু আছে। মনে মনে ভাববার। কিন্তু তার একটি বিন্দুও মুখ দিয়ে দূরে থাক্, নিশ্বাসের সঙ্গেও প্রকাশ করার উপায় নেই। অথচ কথাটা গোপনীয় কিছু নয়। গোপন নেইও। স্ত্রী জ্যোতির্ময়ী জানেন। জানেনা একমাত্র পুত্র প্রিয়োতোষ—যার নিজেরই কয়েকটি ছেলে-মেয়ে হয়েছে, কন্যা মৃন্ময়ী ও নাতি-নাতনীরা।

সেই জানা কথা, কেউ বা ভুলে গেছে, কেউ বা ভোলে নি, তাই নিঃশব্দে, মনের একান্ত গভীরে রোমন্থন করছেন প্রমথনাথ দিনে রাতে এবং দিনের পর দিন।

মুখ ভালো মনে পড়ে না। মনে পড়ার কথাও নয়। ছাঁদনাতলায় সকলের পীড়াপীড়িতে, ভদ্রতার খাতিরে, একবার চোখ মেলে চেয়েছিলেন মাত্র। তখনই আশাভঙ্গের বিরক্তিতে চোখ নামিয়ে নিয়েছিলেন।

কী বিশ্রী মুখ! যেমন রঙ, তেমনি শ্রী!

তখন এম-এ পাস করে আইনের শেষ পরীক্ষার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিলেন প্রমথনাথ।

তার পরেও অনিবার্যভাবে কয়েকবার দেখা হয়েছে। কিন্তু সেও না দেখাই। সংসারে পথ চলতে অনেক জিনিস আমাদের চোখে পড়ে। কোনটা ভালো, কোনটা মন্দ। কিন্তু চোখে পড়া মানেই দেখা নয়। যা আমাদের চোখে পড়ে, তার সবটাই আমরা দেখি না।

কালীতারাও অনেকবার প্রমথনাথের চোখে পড়েছেন। কিন্তু প্রমথনাথ

তাকে দেখেন নি। অন্তত সেই অনেকবার-চোখে-পড়া মেয়ের মুখ আজ পঞ্চাশ বৎসর পরে প্রমথনাথ স্মরণ করতে পারছেন না।

কিন্তু তাতে কিছু অসুবিধা হচ্ছে না। মুখটাই বড় নয়। না-ই বা মনে পড়ল মুখ, অনেক টুকরো কথা—কিছু কালীতারার, কিছু কালীতারার বাপ-মায়ের, কিছু তাঁর নিজের বাপ-মায়ের, অন্তরঙ্গ বন্ধুবান্ধবের—সমস্ত মিলিয়ে এই মৃত্যুপথযাত্রী বৃদ্ধের মুদ্রিত চোখের সামনে এক নতুন কালীতারার আবির্ভাব হয়েছে। নতুন, কিন্তু সেই পুরনো কালীতারা থেকে অভিন্ন।

তাই রোমন্থন করছেন তিনি দিন-রাত্রি এবং দিনের পর দিন।

রোমন্থন করছেন অকস্মাৎ রোগশয্যায় নয়, যখন মৃত্যু শিয়রে। রোমন্থন করছেন কয়েক বৎসর থেকেই, যখন মৃত্যুর কথা তাঁর চিন্তাতেও আসে নি।

যাঁর কথা গত প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে একবার পলকের জন্যেও ভাবেন নি, গত কয়েক বছর থেকে কেন তাঁরই কথা বারে বারে মনে পড়ছে, তাও তিনি বলতে পারেন না।

কিন্তু পড়ছে।

অনেক টুকরো কথা, আরও টুকরো টুকরো হয়ে, এলোমেলো ভাবে।

মনে পড়ছে, বিয়ের কয়েক মাস পরে একদিন গভীর রাত্রে পিতার শয়নকক্ষের পাশ দিয়ে চলতে চলতে মাকে বলতে শুনেছিলেন: কাজটা ভালো কর নি গো। এমন জোর করে বিয়ে দেওয়া উচিত হয় নি।

পিতা কী উত্তর দিয়েছিলেন, শোনা যায় নি। হয়তো কোন উত্তরই দেন নি তিনি। নিঃশব্দে গৃহিণীর অনুযোগ মেনে নিয়েছিলেন মনে মনে। কি হয়তো মেনে নেন নি। তাঁর মনের মধ্যে জেদের লাভাপ্রবাহ তখনও টগবগ করে ফুটছিল।

মনে পড়ে, বন্ধুরাও একবাক্যে বলেছিলেন, কাজটা ভালো হয় নি। এমন বিয়ে না করলেই পারতে।

দেবার মত একটি উত্তরই প্রমথনাথের ছিল: উপায় ছিল না।

কথাটা মিথ্যা নয়। উপায় সত্যই ছিল না। দুর্দান্ত জমিদার নরেন্দ্রনাথের নামে বাঘে-বলদে এক ঘাটে জল খেত। পিতার আদেশে বিবাহ না করে প্রমথনাথের উপায় ছিল কোথায়?

কিন্তু কাজটা ভালো হয় নি।

প্রমথনাথের মা একথা স্বীকার করেছেন, বন্ধুরা স্বীকার করেছেন, মৃত্যুর পূর্বে অশেষ অনুতাপের সঙ্গে নরেন্দ্রনাথও স্বীকার করে গেছেন এবং প্রমথনাথ নিজেও স্বীকার করেন।

অথচ উপায় ছিল না।

হয়তো এরই নাম ভবিতব্য।

কালীতারার ভবিতব্য, এবং তাঁর নিজেরও।

এক ফোঁটা চোখের জলের মত অন্তত এই একবিন্দু সান্ত্বনা মুমূর্ষু বৃদ্ধের মুখের সামনে চিকচিক করছে।

জ্যোতির্ময়ী এসেছেন অনেক পরে।

নরেন্দ্রনাথের জীবিতকালে দ্বিতীয় দারপরিগ্রহের সাহস প্রথমনাথের ছিল না। নরেন্দ্রনাথ জানতেন সে কথা। তাঁর মনের কোণে হয়তো একটা আশা ছিল, আজকালকার ছেলেরা বংশের থেকে রূপ পছন্দ করে। রূপসী বউ না পেলে তারা ক্ষেপে যায়। তখন তারা তড়পায় খুব। সুতো ছেড়ে দিতে হয় তখন। টান দিলে সুতো ছিঁড়ে যাবার আশঙ্কা থাকে। লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে, ছুটোছুটি করে মাছ ক্লান্ত হয়ে পড়লে তখন তাকে ধীরে ধীরে ডাঙায় তুলতে হয়।

তিনি অপেক্ষা করতে লাগলেন।

প্রমথনাথ আইন পাস করে হাইকোর্টে বেরুতে লাগলেন। বেরুনো মাত্রই পশার হয় না। খুব কষ্টেই তাঁর বাসাখরচ চলে, সকালে-বিকালে দুটো ট্যুইশান করে। তার পরে একটি বেসরকারী কলেজে অধ্যাপনার কাজ পেলেন। তারও মাইনে বেশী নয়। একটা লোকের বাসাখরচ চলে যায় মোটামুটি।

সুবিধার মধ্যে বাপের কাছে হাত পাততে হয় না।

না হলেও সে দুর্দিন বড় সামান্য ছিল না। নরেন্দ্রনাথ ভেবেছিলেন, এই দুর্দিনে প্রমথনাথের পক্ষে আর বেশী দিন মেরুদণ্ড সোজা রাখা সম্ভব হবে না। মাছ ক্লান্ত হয়ে আসছে। এইবার ডাঙায় উঠবে।

এতকাল পরেও সে কথা ভাবতে প্রমথনাথের বিবর্ণ ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটে উঠল : নরেন্দ্রনাথ ভুল বুঝেছিলেন। দুর্দিন যত চাপতে লাগল, প্রমথনাথের জেদও তত চড়তে লাগল।

অবশেষে পাটোয়ারী বুদ্ধি খাটিয়ে নরেন্দ্রনাথ মৃত্যুর পূর্বে আর এক কাণ্ড করে বসলেন : তাঁর সমস্ত সম্পত্তি স্ত্রী এবং পুত্রবধূ দুজনের মধ্যে সমান ভাগ করে দিয়ে উইল করে গেলেন। উইলে আরও উল্লেখ থাকল যে স্ত্রীর অবর্তমানে তাঁর অংশ পুত্রবধূই পাবেন।

এতদিন পর্যন্ত কালীতারার উপর প্রমথনাথের মায়ের যথেষ্ট স্নেহ ছিল। কিন্তু উইলে একমাত্র পুত্র যখন সম্পত্তি থেকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হল, তখন

তিনি অকস্মাৎ পুত্রবধূর উপর বিরূপ হলেন। করুণার সঙ্গে মিশে মাতৃস্নেহ পুত্রের দিকে ছুটল। তাঁর ধারণা হল, এই অনর্থের মূল কালীতারা। তাঁকে তিনি ক্ষমা করতে পারলেন না। দেখতে দেখতে কালীতারা তাঁর দুচক্ষের বিষ হয়ে উঠলেন। এবং শ্বশুরগৃহে থাকা নিরর্থক দেখে একদিন পিত্রালয়ে চলে গেলেন।

জ্যোতির্ময়ী এলেন তার পরে, মাতৃ-সম্পত্তির সাহায্যে প্রমথনাথের অবস্থা একটু স্বচ্ছল হলে।

কত কালের কথা! কিন্তু রোগশয্যায় শুয়ে প্রমথনাথের মনে হয় যেন দিন কয়েক আগের কথা। নববধূবেশে জোতির্ময়ীর রূপ যেন আর ধরে না। সেই রূপের কাছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তুচ্ছ হয়ে যায়।

সেই রূপের বন্যায় যুবক প্রমথনাথ ভেসে চললেন একখানা ছোট্ট জেলে-ডিঙির মত—কালীতারা যেন দূরে আরও দূরে।

কিন্তু দূরে খুব নয়।

যখন জ্যোতির্ময়ী একখানা আকাশের মত তাকে বেষ্টন করে ফেলেছেন, আর সেই দিগন্তরেখার মধ্যে কালীতারাকে একটা কালো বিন্দুর মতও দেখা যাচ্ছে না, তখন হঠাৎ কালীতারার কাছ থেকে একখানি চিঠি এল:

শ্রীচরণেষু,

বাবার মুখে শুনিলাম তুমি আবার বিবাহ করিয়াছ। শুনিয়া যে কী আনন্দ হইল তাহা বুঝাইয়া বলিবার নয়। তোমার জন্য বড় কষ্ট হইত। আমার কিছুই নাই, না রূপ না বিদ্যা। তোমাকেও কিছু দিতে পারি নাই। তোমার সমস্ত জীবন কী করিয়া কাটিবে, ভাবিতেও বুকের ভিতরটা কী রকম করিয়া উঠিত। এখন নিশ্চিন্ত হইলাম।

তোমাকে আমার আরও কিছু বলিবার আছে। সেটা খুবই জরুরী। এই চিঠির উত্তর পাইলে সাহস করিয়া বলিব। ভগবান তোমাদের উভয়কে কুশলে রাখুন। তুমি আমার প্রণাম নাও এবং জ্যোতি ভগ্নীকে আশীর্বাদ দিও। ইতি—

সেবিকা

কালীতারা

এও কতকালের কথা। কিন্তু মনে হয় সেদিন।

কালীতারার মুখ মনে পড়ে না। সে চিঠিও আর নাই। কিন্তু মোটামোটা ভাঙা ভাঙা অক্ষরগুলো যেন চোখের সামনে ভাসছে।

জ্যোতির্ময়ীর রূপের ছোঁয়ায় তখন প্রমথনাথের মনের কপাট খুলে গেছে। আকাশ বিস্তৃত এবং উদার। সেই ঔদার্যে তিনি এ চিঠির উত্তর দিয়েছিলেন। যদিচ চিঠিখানি জ্যোতির্ময়ীকে দেখাতে কিংবা এ সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করতে তিনি সাহস করেন নি।

তার উত্তরে কালীতারার কাছ থেকে আর-একখানা চিঠি এল। এইখানাই সবচেয়ে জরুরী। এও আগের চিঠির মতই সংযত সংক্ষিপ্ত। সামান্য দুই একটা কথার পর লেখা হয়েছে :

"শ্বশুর ঠাকুর তাঁর সম্পত্তির অর্ধেক আমাকে দিয়া গিয়াছেন। কেন যে এরূপ করিয়া গেলেন জানি না। ইহাতে আমি খুবই কষ্ট পাইতেছি। আমার বাবার অর্থের অভাব নাই। তাঁহার সংসারে দুই বেলা দুই মুঠা খাইবার অসুবিধা কোনদিন হইবে না। তোমাকে আমি ভালো জানি না। কিন্তু যতটুকু জানি, অভাবে পড়িলে তুমিও সাহায্য না করিয়া পারিবে না। তবে শ্বশুর-ঠাকুর এমন করিলেন কেন?

যাহাই হউক, তোমার এই বিবাহের পর মায়ের মন একেবারেই ভাঙিয়া গিয়াছে। বাহির হইতে দেখিলে স্পষ্ট বোঝা যায় না বটে; কিন্তু আমি বুঝিতে পারি : তিনিও যেন একটা প্রকাণ্ড ধাক্কা সামলাইবার প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন। কেবল, বিশ্বাস কর, আমি সুখী হইয়াছি। তোমার জীবনে একটা অভিশাপ হইয়া থাকিয়া বড় মনোকষ্টে ছিলাম।

বাবা এবং মা আমাকে লইয়া বৃন্দাবন যাইবার সংকল্প করিয়াছেন। সেই মত তিনি সম্পত্তির ব্যবস্থা করিতেছেন। শেষ জীবন তাঁহারা আমাকে লইয়া সেখানেই কাটাইবেন। শ্বশুরঠাকুর, হয়তো ভালো হইবে আশা করিয়াই যে বাঁধনে আমাকে বাঁধিয়া গিয়াছেন, গোপাল-গিরিধারীর চরণে পৌঁছিবার পূর্বে সে বাঁধন খুলিয়া যাইতে চাই। তুমি তো উকিল, একটা দানপত্র লিখিয়া দাও না। দানপত্র আর কী! তোমাদের সম্পত্তি ভুলিয়া আমার হাতে আসিয়া পড়িয়াছে। সেই অন্যায় সংশোধন করিতে চাই। বাবা মা আমার ইচ্ছায় সম্মত হইয়াছেন। তুমি দয়া করিয়া সম্মত হও, ইহাই প্রার্থনা।

সময় বেশী নাই। সুতরাং তাড়াতাড়ি দলিলটা পাঠাইও। আমি সই করিয়া দিব এবং বাবা স্বয়ং সাক্ষী হইবেন।"

এই চিঠিখানা প্রমথনাথের লোহার সিন্ধুকে এখনও বোধ হয় আছে। তাঁর পশার তখনও তেমন জমে নি। খরচপত্র সম্বন্ধে জ্যোতির্ময়ী খুব হিসাবী নন। অধ্যাপনার সামান্য বেতন এবং অর্ধেক সম্পত্তির আয়ে তাঁর

টানাটানি চলছিল। তবু এতে তিনি অসম্মতি জানিয়েছিলেন। তাঁর রক্তেও দুর্দান্ত জমিদার নরেন্দ্রনাথের জেদ।

কিন্তু শুধুই কি তাই?

আজ রোগশয্যায় শুয়ে প্রমথনাথ অতীতের অন্ধকার হাতড়ান। শুধু তাই নয়। পিতার জবরদস্তি যা পারে নি, ওই এক ফোঁটা মেয়ের চিঠিতে তাই সম্ভব করেছিল। এতদিন মনে হত পিতার জেদে নত হয়ে বিয়ে করাটা উচিত হয় নি। সেদিন চিঠিখানা হাতে করে আর একটা প্রশ্ন জেগেছিল: বিবাহ যখন পিতার জেদে হয়েই গেল, তখন আবার একটা বিবাহ করা কি ঠিক হল?

বৃন্দাবন যাত্রার আগে পায়ের ধুলো চেয়ে কালীতারা একখানা চিঠি দিয়েছিলেন। তার অর্থ, একবার চোখের দেখা। হয়তো শেষ দেখা। শেষ দেখাই তো। কালীতারা বৃন্দাবনে রয়েই গেছেন। তাঁর পিতামাতা পরলোকে। মেয়ের জন্যে তাঁরা একখানা বাড়ি, বরং মন্দির বলাই ভালো, আর দেবসেবার ব্যয়নির্বাহের জন্যে সেইখানেই সামান্য কিছু সম্পত্তি রেখে গেছেন। তাই নিয়ে সেইখানেই রয়ে গেছেন তিনি। আর এখানে, এই কলকাতা শহরে প্রমথনাথ। মৃত্যুশয্যায়।

শেষ দেখাই তো।

প্রমথনাথের ঠিক মনে পড়ল না, বৃন্দাবন থেকে এ পর্যন্ত কখানা চিঠি দিয়েছেন কালীতারা। তিনখানা, না আরও বেশী? ঠিক মনে পড়ল না। শেষ চিঠি কবে এসেছিল? সে চিঠির কি তিনি উত্তর দিয়েছিলেন?

তাঁর মনশ্চক্ষু স্মৃতির অন্ধকার পাথারে লগি ঠেলে উজানে চলতে লাগল।

না, সে চিঠির উত্তর দেওয়া হয় নি বোধ হয়। ঠিক সেই সময়েই হাইকোর্টে তাঁর পশার জমতে আরম্ভ করেছে। সকাল-সন্ধ্যায় বাড়িতে এবং দুপুরে কোর্টে মক্কেলের ভিড় লেগেছে। সেইবারেই বড় ছেলে প্রিয়তোষের জন্ম হল বোধ হয়।

না। কালীতারার শেষ চিঠির জবাব দেওয়া হয়ে ওঠে নি। কী যে লিখেছিলেন তিনি সেই শেষ চিঠিতে তাও এখন আর মনে পড়ে না। প্রথম প্রথম মাঝে মাঝে মনে পড়ত। দূরের মেঘে বিদ্যুচ্চমকের মত। আবছা মনে পড়ত। কারণ ওর আকাশে তখন অঢেল আলো।

তার পরে আর আবছাও মনে পড়ত না।

বহুকাল পর্যন্ত না। মনে পড়তে শুরু করেছে দুরারোগ্য ব্যাধিতে বিছানা নেওয়ার পর থেকে। সব চেয়ে আশ্চর্য, মনে যা এখন পড়ছে, সবই পুরনো কথা, ভুলে-যাওয়া কথা। নতুন কথা ভুল হয়ে যাচ্ছে।

প্রিয়তোষ সমস্ত সকালটা তাঁর বিছানার পাশে বসে থাকে। অফিস যাওয়ার সময়ও এক মিনিট দাঁড়িয়ে থেকে দুটো কুশল প্রশ্ন করে যায়। অফিস থেকে ফিরে হয় ডাক্তারের বাড়ি ছোটে, নয় বাপের কাছেই বসে। তাকে প্রমথনাথের মনে পড়ছে না।

সাংসারিক কর্মের ফাঁকে ফাঁকে জ্যোতির্ময়ী প্রায়ই এসে বসছেন। ঔষধ খাওয়াচ্ছেন, পথ্য দিচ্ছেন, গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। তাঁকেও মনে পড়ছে না। কী যে হয়েছে প্রমথনাথের, কাছের জিনিস দূরে সরে গেছে, দূরের জিনিস কাছে এসেছে।

কাছে এসেছে তাঁর ছেলেবেলার বন্ধুবান্ধব, স্কুল-কলেজের সতীর্থ দল—যাদের কেউ বা বেঁচে আছে, কেউ বা নেই। কাছে এসেছে তাঁর দেশের বাড়ি, বাড়ির পিছনের পদ্মদীঘি, ঠাকুরদালান-নাটমন্দির, পুরনো নায়েব-গোমস্তা-কর্মচারীর দল।

সব চেয়ে কাছে এসেছেন কালীতারা, যাঁর মুখও তাঁর ভাল করে মনে পড়ে না। অথচ তিনি থাকেন দূরে। দেশের থেকে অনেক দূরে। বৃন্দাবনে।

মায়ের মৃত্যুর পরে প্রমথনাথের স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তির মালিক হলেন কালীতারা। সেই সময় তিনি প্রমথনাথকে যে চিঠি লিখেছিলেন সম্ভবত সেইটিই কালীতারার সর্বশেষ চিঠি। অন্তত সেই চিঠিটার কথা প্রমথনাথের এখনও স্মরণ আছে।

অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত চিঠি: "ম্যানেজারের কাছ থেকে তোমাদের সমস্ত সম্পত্তির তালিকা পেলাম। এখানকার উকিল দিয়ে দানপত্র তৈরি করালাম। আমাকে আর কষ্ট দিও না। দয়া করে গ্রহণ করে দায়মুক্ত কর।"

মনে হচ্ছে, এই শেষ চিঠিটারই তিনি উত্তর দেন নি। যদিও কালীতারাকে আর তিনি কষ্ট দেন নি। দানপত্র গ্রহণ করেছিলেন।

রোগশয্যায় শুয়ে শুয়ে এই সব পুরনো কথা বিস্মৃতির অতল গর্ভ থেকে তুলে বাছতে বাছতে অকস্মাৎ একটা উদ্ভট খেয়াল প্রথমনাথের মাথায় এল: দেশে যাব।

জ্যোতির্ময়ী এবং প্রিয়তোষকে ডেকে এ কথা বলতে তাঁরা তো অবাক! মায়ের মৃত্যুর পর প্রমথনাথ আর দেশে যান নি। কোনদিন দেশের উল্লেখ মাত্র তাঁর কাছে কেউ শোনে নি। সময়ের অভাব ছিল না। হাইকোর্টে লম্বা লম্বা ছুটি। প্রত্যেক ছুটিতে তিনি বাইরে গেছেন বেড়াতে। গ্রীষ্মে দার্জিলিং সিমলা, কর্সিয়াং, শিলং। পূজায় দক্ষিণে কিংবা পশ্চিমে। একটা ছুটিতে ঘুণাক্ষরেও দেশে যাওয়ার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন নি। হঠাৎ এ কী উদ্ভট খেয়াল।

বললেন, দেশের জন্য মনটা বড়ই অস্থির হয়েছে।

—সেখানে কে আছে যে, তার জন্য অস্থির হয়েছে?

হেসে বললেন, তোমাদের ধারণা মানুষের জন্যে, আত্মীয়-স্বজনের জন্যে গ্রামের ওপর টান? তা নয়। গ্রামের জন্যেই গ্রামের ওপর টান। নেই কী? পদ্মদীঘি ভরে পদ্মফুল। জানলা খুললেই চোখে পড়বে কৃষ্ণচূড়া আর কনকচাঁপার গাছ। ছেলেবেলায় ওই দুটো গাছই আমি পুঁতেছিলাম। এখন তাতে কত ফুল, কত বাহার! ওরাও আত্মীয়, ওরাও টানে। আমি যাবই।

জ্যোতির্ময়ী আর প্রিয়তোষ সন্দিগ্ধভাবে পরস্পরের মুখের দিকে চান। প্রমথনাথের মাথা কি সুস্থ নেই?

—যাবে যে, কী করে যাবে। স্টেশন থেকে অতখানি রাস্তা গরুর গাড়ির ঝাঁকুনি সইতে পারবে?

—খুব পারব। পেটের দায়ে শহরে বাস করলেও আমি তো পাড়াগাঁয়ের ছেলে। গরুর গাড়ির ঝাঁকুনি আমাকে লাগেই না। খড়ের ওপর বেশ পুরু করে বিছানা করে দিয়ো।

জ্যোতির্ময়ী স্বামীর বালসুলভ আবদারে স্নেহে ধমক দিয়ে বললেন, থাম। আর বলতে হবে না। হয়েছে। কিন্তু সেখানে যে যাবে, এই কঠিন অসুখ। সেই অজ পাড়াগাঁয়ে কি ডাক্তার আছে, না ওষুধ আছে, না পথ্যি পাবে?

এবারে প্রমথনাথ গম্ভীর হলেন। শান্তকণ্ঠে বললেন, তোমরা কি ভাব, ডাক্তার জবাব দিয়ে গেছেন, আমি জানি না তা? জ্যোতু, মরতেই যদি হয়, এখানে মরার কোন মানে হয়? তার চেয়ে কোনক্রমে দেশে গিয়ে মরতে পারলে হাড় ক'খানা জুড়োবে।

জ্যোতির্ময়ীর একখানা হাত ধরে প্রমথনাথ ছোট ছেলের মত কাঁদতে লাগলেন: তোমরা বাধা দিয়ো না। আমাকে আমার দেশের বাড়িতে নিয়ে চল।

কিন্তু প্রমথনাথ পাগল হলেও জ্যোতির্ময়ী তো আর পাগল হন নি।

প্রিয়তোষও না। যা এ অবস্থায় হবার নয়, তা নিয়ে অকারণে তাঁরা মাথা ঘামালেন না।

সান্ত্বনা দিলেন, তুমি সেরে ওঠ। তার পরে আমরা সবাই মিলে বেশ কিছুদিন দেশে গিয়ে থাকব। এখন নয়।

সুতরাং প্রমথনাথ হতাশভাবে এ সাধ বিসর্জন দিলেন।

কিন্তু দিন কয়েক পরে আর-একটা সাধ তাঁকে পেয়ে বসল। জেদ ধরলেন, কালীতারাকে টেলিগ্রাম করে নিয়ে আসতে হবে।

প্রিয়তোষ তো আকাশ থেকে পড়ল। জীবনে সে কখনও কালীতারার নামও শোনে নি—না বাপের কাছে, না মায়ের কাছে। উভয়েই এই কথাটা সযত্নে তাদের কাছ থেকে গোপন রেখেছিলেন।

সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি কে?

প্রমথনাথ বলতে যাচ্ছিলেন, তোমার বড়মা। কিন্তু জ্যোতির্ময়ী তার মুখ চাপা দিলেন।

বললেন, তুমি বাইরে যাও প্রিয়। ওসব তোমাকে শুনতে হবে না।

প্রিয়তোষ চলে যেতে জ্যোতির্ময়ী কপালে করাঘাত করে বললেন, হা আমার পোড়া কপাল! তাঁকে ভোল নি এখনও?

প্রমথনাথ অম্লান বদনে স্বীকার করলেন, না। তা ছাড়া তাঁকে দরকার আছে।

—দরকার আছে! এতকাল পরে হঠাৎ তাঁকে দরকার পড়ল?

—হ্যাঁ। তুমি জান না, আমাদের যা-কিছু পৈতৃক সম্পত্তি, তার মালিক আমি নই, তিনি। বাবা আমার ওপর রেগে এইটে করে গেছেন। তিনি আবার আমার নামে এটা দানপত্র করে গেছেন।

এ সমস্ত বিন্দুবিসর্গও জ্যোতির্ময়ী জানতেন না। প্রমথনাথ এ সম্পর্কে কোনদিন তাঁর সঙ্গে আলোচনা করেন নি।

সবিস্ময়ে বললেন, তাই নাকি?

—হ্যাঁ। কিন্তু দানপত্র গ্রহণ করলেও তাঁর দান আমি গ্রহণ করি নি। ওই সম্পত্তির একটা পয়সাও আমি ছুঁই নি। এখন আমার অবর্তমানের কথা ভেবে ওই সম্পত্তি সম্বন্ধে একটা ব্যবস্থা করা দরকার। ওর ওপর ন্যায়ত আমাদের কোনও অধিকার নেই।

—কী করবে তা হলে? সম্পত্তি ফেরত দেবে?

—না। তাঁকে অপমান করা হবে তাতে। আমি তাঁর সম্পত্তির জন্য

একটা ট্রাস্ট করেছি। তার মধ্যে তুমি আছ, প্রিয়ও আছে, আর আছে গ্রামের একটি বন্ধু। সম্পত্তির সমস্ত আয় দিয়ে বাবার নামে একটা স্কুল, মায়ের নামে একটা বালিকা-বিদ্যালয় আর কালীতারার নামে একটা হাসপাতাল তৈরি হবে।

—এইজন্যে তাঁকে দরকার?

—না, শুধু এই জন্যেই নয়, এতদিন পরে তাঁকে একবার দেখবার জন্যে মনটা বড় ব্যাকুল হয়েছে।

নিঃশব্দে কিছুক্ষণ জ্যোতির্ময়ী কী ভাবলেন তিনিই জানেন। জিজ্ঞাসা করলেন, তাঁর ঠিকানা জান?

—জানি।

প্রমথনাথ ঠিকানাটা বলে দিলেন।

সেই দুপুর থেকেই আশঙ্কিত সঙ্কট-মুহূর্তের আবির্ভাব হল। সন্ধ্যার পরেই যেন ঘরের দেওয়ালে দেওয়ালে মৃত্যুর ছায়া ঘুরে বেড়াতে লাগল। সমস্ত বাড়িতে নেমে এল স্তব্ধতা।

চাকর বাইরে থেকে একটা টেলিগ্রাম এনে জ্যোতির্ময়ীর হাতে দিলে। কালীতারার কাছ থেকে জবাব এসেছে:

কলকাতা যাওয়া এখন অসম্ভব। আজ রাত্রে গুরুদেবের সঙ্গে তীর্থপর্যটনে বার হচ্ছি। কবে ফিরব জানি না। ভগবান তোমাকে নিরাময় করুন।

এ টেলিগ্রামের অর্থ কী?

অর্থ বুঝতে পারতেন একমাত্র প্রমথনাথ। বুঝতে পারতেন, এবং বুঝে নিশ্চিন্ত হতেন, পৃথিবীতে কালীতারার চাওয়া-পাওয়ার বাঁধন খুলে গেছে। আর কাকেও তাঁর প্রয়োজন নেই।

কিন্তু প্রমথনাথ তখন মৃত্যুর দ্বারদেশে

॥ মানুষের মানে ॥

সময়টা ঠিক মনে নেই। কেবল এইটুকু মনে পড়ে যে, তখনও মাঠে পাকা ফসলের সোনালী বিছানা পাতা রয়েছে এবং সকাল-সন্ধ্যায় শীতের মিষ্টি আমেজ পাওয়া যায়।

কী একটা উপলক্ষ্যে গ্রামের বাড়িতে গিয়েছি। ভোরের প্রভাতী গানে ঘুম ভাঙল। দ্বৈত সঙ্গীত: একটি কণ্ঠ ভারি এবং পরিণত, আর-একটি কাচা কিশোর-কণ্ঠ। পরিণত কণ্ঠটি চিনতে বিলম্ব হল না। জ্ঞান হওয়ার পর থেকে প্রতি বৎসর এই সময়টিতে শুনে আসছি।

আমাদের উদ্ধব দাসের কণ্ঠ। কিন্তু কিশোরটি কে? উদ্ধবের তো ছেলেপুলে নেই।

কথাটা সকালেই উদ্ধবকে জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার সঙ্গে যে গান গাইছিল ওটি কার ছেলে হে? বড় মিষ্টি গলা তো!

—আজ্ঞে, কার ছেলে তা আমিও জানি না, ও নিজেও জানে না।

—সে আবার কা!

—আজ্ঞে, ঠাকুর ওটিকে জুটিয়ে দিয়েছেন শেষ বয়সে। নিজের তো আর ছেলেপুলে হল না! তা গায় বড় ভালো।

সন্ধ্যার পরে উদ্ধব ছেলেটিকে নিয়ে এল আমার কাছে। চমৎকার দেখতে! রঙ ফরসা নয়, কিন্তু মাথার ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া চুলে, বড় বড় চোখে ভারি মিষ্টি চেহারা!

বললাম, একটা গান শোনাও দেখি।

গান শোনাতেই যে এসেছিল তা উদ্ধবের হাতের একতারা ডুগিতেই বোঝা যাচ্ছিল। বলামাত্রই দুজনে গাইতে আরম্ভ করলে—একটার পর একটা, বিনা অনুরোধে, অনেকগুলো গান।

উদ্ধব গৃহী-বাউল। বিঘে দুয়েক পৈতৃক জমি আছে, সেটুকু নিজেই চাষ করে। বিবিধ পাল-পার্বণে সিধা পায়। বাড়িতে নিজে আর স্ত্রী। সুতরাং তাতেই চলে যায় তাদের। প্রচুর অবসর সময়ে গান গায়, নয়তো

কাছাকাছি কোথাও মহোৎসব হচ্ছে, কিংবা বাউলের সমাবেশ হয়েছে শুনলেই চলে যায় সেখানে।

সঙ্গে চলে নন্দদুলাল মাথায় পুঁটলি নিয়ে আর সমস্ত পথ গানে গানে মুখরিত করতে করতে। যারা ওদের সঙ্গে চলে তাদেরও যেন পথচলায় কষ্ট হয় না।

চাষীরা বলে, বাবু মশায়, আমাদের অনেক কাজ দুলালই করে দেয়।

—কী রকম?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। মাঠে যেদিন ও থাকে না, সেদিন মাটি যেন পাথর হয়ে যায়—লাঙ্গল-কোদাল আর চলে না। আকাশে যেন-দু-তিনটে স্যিয্যি ওঠে—কাজ করতে পারি না।

—কী করে ও?

কিছুই করে না। শুধু গরু ছেড়ে দিয়ে গাছের ছায়ায় বসে গান গায়। তারপরে হঠাৎ এক সময় দেখি ধান-কাটা শেষ হয়ে গিয়েছে—এক দিনের কাজ এক বেলাতেই। গামছা-বাঁধা জলখাবার আলের মাথাতেই পড়ে আছে, খেতে মনেই ছিল না।

তারা হাসে।

জিজ্ঞাসা করি, কী গান গায়?

তারা হাত উলটে বলে, কী যে গায় সে ওই জানে মশায়, কিন্তু হাওয়ায় যেন নেশা লাগে। আশ্চয্যি কাণ্ড, গরুগুলো পর্যন্ত নড়ে না যেন। যতদূর ওর গান শোনা যায়, তার বাইরে আর যায় না।

বিস্মিত হয়ে বলি, বল কী হে!

—আজ্ঞে হ্যাঁ। বললে পেত্যয় যাবেন না বাবু মশায়, কিন্তু নিজের চোখে দেখেছি গাছের পাতাগুলো পর্যন্ত ওর গান শুনে যেন ঝুলে পড়ে। ও চলে গেলে মাঠখানাও যেন কী রকম করে!

—কী রকম করে?

ব্যাপারটা বোঝাবার জন্যে মনে-মনে ওরা যেন দৃষ্টান্ত হাতড়ায়। তারপর বলে, কী রকম জানেন, বাছুর হারালে গাই-গরু যেমন করে তেমনি যেন। যেন চকমক করে কী যেন খোঁজে! কতদিন আমরা বলাবলি করেছি একথা, না হে!

সবাই গম্ভীরভাবে সায় দিলে।

এর কিছুদিন পরে পাশের একটা গ্রামে গিয়েছিলাম জনসভায় বক্তৃতা

দিতে। কম্যুনিজ্‌ম্‌, সোস্থালিজ্‌ম্‌, গান্ধীজ্‌ম্‌ সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করলাম। কেমন হবে আমাদের সমাজব্যবস্থা, কেমনই বা রাষ্ট্রব্যবস্থা—কী ব্যবস্থায় মানুষ হবে সুখী, সুন্দর এবং স্বাস্থ্যবান, তার জীবনে অধিষ্ঠান হবে সত্য-শিব-সুন্দরের, তাই নিয়ে অনেক মনোজ্ঞ কথা বললাম। বুঝিয়ে দিলাম, মানুষের মানে কী

শ্রোতারা বললে, হ্যাঁ, একটা বক্তৃতা শুনলাম বটে। এমন কথা কোথাও শুনি না।

সেখান থেকে ফিরছিলাম, হাঁটা-পথের রাস্তা। তখন অল্প রাত্রি হয়েছে। সামনেই একটা তালগাছের আড়ালে ত্রয়োদশীর চাঁদ। চারিদিকে যতদূর দেখা যায়, সমস্ত যেন চাঁদের আলোয় ভাসছে।

অবশেষে গ্রামের মাঠে এসে পড়লাম। নদীর ধারে এসে হাত-মুখ ধুচ্ছি, মনে হল একটা অস্পষ্ট স্বর যেন অনেক দূর থেকে ভেসে আসছে। খুব অস্পষ্ট, কান পেতে না শুনলে বোঝা যায় না। সেদিকে খেয়াল না রেখেই হাত-মুখ ধুয়ে আবার আমরা হাঁটতে শুরু করলাম।

আমাদের মধ্যে তখন 'মানুষের মানে' নিয়ে তর্ক উদ্দাম হয়ে উঠেছে: কী এর সত্যিকার মানে? সমাজ এবং রাষ্ট্র কার জন্যে? কী তার লক্ষ্য? সুখ এবং সমৃদ্ধি কি এক? ঐশ্বর্য কাকে বলে? এমনি কত কী দুরূহ এবং জটিল প্রশ্ন।

হঠাৎ এক সময় সমস্ত তর্ক স্তব্ধ করে আমরা সবাই গেলাম থেমে।

বন্ধু বললেন, দুলাল গান গাইছে!

তাকে দেখা যায় না। কোথায় বসে গাইছে সে আবছা অনুমান করা যায় মাত্র। কিন্তু সে যেন গানও নয়, গানের জ্যোৎস্না—তরঙ্গের পর তরঙ্গে সমস্ত প্রকৃতিকে যেন ভাসিয়ে দিচ্ছে। কী গাইছে?

"ব্রহ্মাণ্ডের অগ্রভাগে আগে জাগে চোর,
পায়েতে লাল পাগড়ি, মাথাতে সোনার নূপুর।"

মানে কী? মানুষের মানে কী? সমাজ রাষ্ট্রের মানে কী? 'তা দেখে নিত্য মানুষ উঠল আশমানে!' কে নিত্য মানুষ?

বামুনগড়ের পাড়ে গুটি পাঁচেক তালগাছ ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে আছে। তারই মধ্যে বসে উদ্ধব আর দুলাল।

—কী করছ উদ্ধব? এখানে বসে গান গাইছ?

—আজ্ঞে গান নয় বাবু মশায়, গলা সাধছি। কোত্থেকে ফিরছেন?

—মদনপুর থেকে। বড় চমৎকার গাইছিলে যে!

এই ঘটনার বছর পনেরো পরে।

পুজোর বন্ধে বাড়ি গেছি, উদ্ধব নিঃশব্দে এক ধারে এসে বসল।

—কেমন আছ উদ্ধব?

—আজ্ঞে, ভালো নাই।

উদ্ধবের চেহারা খারাপ হয়ে গেছে। মাথার বড় বড় চুল, আবক্ষলম্বিত দাড়ি পেকে কাশফুলের মত ধবধব করছে। উদ্ধব একেবারে অথর্ব হয়ে গেছে।

—আপনি অনেকদিন পরে গাঁয়ে এলেন বাবু!

—হ্যাঁ ভাই। কাজের চাপ, খরচ-খরচা, ঘন ঘন দেশে আসতে আর পারি না।

—তাই বটে।

বললাম, অনেক দিন পরে এলাম উদ্ধবদাদা, মাকে আজ গান শোনাতে হবে যে! তুমি আর দুলাল।

উদ্ধব যেন চমকে উঠল। বললে, দুলাল তো এখানে থাকে না বাবু মশায়।

—কেন?

—এখানে খাবে কী বাবু মশায়? কাঁচড়াপাড়ায় কী একটা কারখানায় কাজ করছে। বছর পাঁচেক হল।

—এখানে আসে না মাঝে মাঝে?

—ওই আপনারই মত, কাজের চাপ···খরচ-খরচা···

—তা বটে। খোঁজখবর নেয় তো তোমাদের?

—ন্-নেয়। মাঝে মাঝে ন্-নেয়। চিঠিপত্র লেখে।

—কেমন আছে?

—ব্-ভালোই আছে শুনি। দিন চার টাকা মজুরি পায়। ভালো থাকারই তো কথা।

—বাঃ! বেশ! শুনে সুখী হলাম।

কিন্তু উদ্ধবের মুখে সুখের কোনও চিহ্ন ফুটে উঠল না। ভাবলাম, পুজোর দিনে অপত্য-বিরহেই এমনটা হচ্ছে। দুলাল বাড়ি আসতে না পারায় বুড়োর মনটা ভালো নেই।

বললাম, তা হোক। তুমি তো আছ। তোমার গানই শোনা যাবে সন্ধ্যের আরতির পর।

—আমি তো আর গাই না বাবু মশায়।

—সে কী!

—আজ্ঞে, গান আর আসে না। একেবারেই আসে না।

আমি আর কিছু বললাম না। কেমন মনে হল, গানের প্রসঙ্গেই ও যেন আসতে চায় না। চুপ করে রইলাম।

একটু পরে উদ্ধব বললে, কাঁচড়াপাড়া কলকাতা থেকে কত দূর বাবু মশায়?

—কাছেই। কেন বল তো? যাবে আমার সঙ্গে?

—আজ্ঞে না। তবে···

—তবে?

—আপনার কি সময় হবে বাবু মশায়?

—কিসের?

—ছেলেটার একবার যদি খবর নিতেন। এদানি অনেক দিন তার খোঁজ-খবর পাই নাই। বিদেশ-বিভুঁই জায়গা।

একটু চিন্তা করে বললাম, তোমাকে ঠিক কথা দিতে পারছি না উদ্ধবদাদা। তবে যাবার চেষ্টা করব। ঠিকানাটা আমাকে দিয়ো বরং। নিজে না যেতে পারলেও কাউকে দিয়ে খবর নেব।

বিকেলে একখানা ছিন্ন মলিন পোস্টকার্ড হাতে করে উদ্ধব এসে উপস্থিত। বললে, এইতে ওর ঠিকানাটা আছে কি না দেখুন তো?

বললাম, আছে। কলকাতায় ফিরেই আমি খবর নেব। তুমি কিছু চিন্তা করো না।

এতক্ষণ পরে উদ্ধব নিঃশব্দে একটুখানি কাঁদল।

কলকাতায় ফিরে দুলালের কথা যথারীতি ভুলেই গিয়েছিলাম। এমন সময় উদ্ধবের একখানা চিঠি এল। ছ-সাত দিন পরে আবার একখানা। বার বার সকাতর মিনতি করেছে, দুলালের খবরটা নেবার জন্যে।

কাজের চাপ ছিল যথেষ্ট। তবু উদ্ধবের মিনতি উপেক্ষা করতে পারলাম না। এবং পরের রবিবারেই চেপে বসলাম কাঁচড়াপাড়ার ট্রেনে।

ওদের কুলি-বস্তিতে যখন পৌঁছলাম, তখনও সন্ধ্যা হয় নি। যেমন নোংরা বস্তি, তেমনি নোংরা রাস্তা। দু ধারে সারি সারি খুপরির মত টালির বস্তি। উন্মুক্ত, ছেঁড়া চটের সাহায্যে কোন রকমে আব্রু রক্ষা করা হচ্ছে। প্রত্যেক ঘরের সামনের সরু জায়গাটুকুতে কোথাও হিন্দুস্থানী বৃদ্ধা ফরসিতে তামাক

টানছে, কোথাও উলঙ্গ শিশুর দল ধুলো ওড়াচ্ছে, কোথাও মদের আড্ডা বসে গেছে।

এই অসংখ্য গুহার মধ্যে কোথায় আছে দুলাল!

অনেককে জিজ্ঞাসা করে, অনেক পথ ঘুরে অবশেষে যখন তার বস্তির কাছাকাছি পৌঁছেছি, তখন একটি লোক আঙুল দিয়ে তার বস্তিটা দেখিয়ে দিলে বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে আরও বললে, ওখানে এখন নাই গেলেন বাবু।

—কেন?

—সে আপনার শুনে কাজ নেই।

—কিন্তু আমার যে বড্ড দরকার বাপু।

—তা হলে যান।

একটা শব্দ আমার কানে আসছিল। যেন একটা স্ত্রীলোকের আর্তনাদ। সঙ্গে সঙ্গে আরও লোক এসে জড়ো হয়েছে। অনেক পুরুষ এবং অনেক স্ত্রীলোক। তাদের আড়ালে কিসের যেন একটা ধস্তাধস্তিও চলেছে।

সেইখানে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, এখানে দুলাল বলে কেউ থাকে? দুলাল দাস?

লোকগুলো চমকে আমার দিকে তাকালে। আমার খাকী ট্রাউজার এবং শোলার টুপির দিকে। একটা অস্ফুট গুঞ্জন উঠল, পুলিস! দেখতে দেখতে অতবড় ভিড় ভোজবাজির মত অদৃশ্য হয়ে গেল। শুধু উঠানে পড়ে রইল রক্তাক্ত, এবং বোধ হয় অচৈতন্যও, একটি স্ত্রীলোক, আর দাওয়ায় একটা খুঁটি ঠেস দিয়ে বসে রইল দুলাল—তার অনাবৃত বাহু দিয়ে রক্ত ঝরছে।

—তুমি দুলাল না? এসব কী কাণ্ড!

দুলাল আমার দিকে চাইলে না। শ্রান্তভাবে চোখ বন্ধ করেই টেনে-টেনে বলতে লাগল: ধরে নিয়ে যাবে বাবা! নিয়ে যাও, আমি পরোয়া করি না। আমার বুকের ভেতরটা জ্বলে গেল, জ্বলে গেল—ঠিক যেন সাপে ছুবলে দিয়েছে গো, কালকেউটে সাপে। আমি আর বাঁচব না।

বলে গড়িয়ে দাওয়া থেকে উঠানে পড়ে পাথরের মত শক্ত হয়ে গেল।

সেদিন ফিরতে আমার অনেক রাত্রি হয়েছিল। দুলাল এবং তার স্ত্রীলোকটির জ্ঞান না ফিরে আসা পর্যন্ত উঠতে পারি নি। আমি যখন উঠলাম, তখন সাম্বিৎ তাদের ফিরেছে বটে, কিন্তু নেশা তখনও কাটে নি।

প্রতিবেশীরা আমার মুখের অবস্থা দেখে সহাস্যে বললে, ভয়ের কিছু নেই

বাবু। রোজ রবিবার ওরা এই রকম করে। বলি, খাস না অত! তা শুনবে না।

তার পাশের লোকটি একেবারে আমার মুখের সামনে এসে বললে হাত ঘুরিয়ে, সে বলতে পারি আমরা। এই যে আপনার কাছে এসে দাঁড়িয়েছি, কিন্তু পা টলছে এতটুকু? তার জো কী!

কিন্তু এসব শুনে আমার লাভ কী? মোট কথা, ভয়ের কিছু নেই। কিছুই নেই, না? তবু এই কথাটাই উদ্ধবকে কী করে যে জানাব, আজও আমি ভেবে পেলাম না।

॥ মরা কাঠগোলাপ ॥

মরা কাঠগোলাপ।

হ্যাঁ। রিক্ত ডাল। ফুল ফোটার পালা কবে শেষ হয়ে গেছে। মরা কাঠগোলাপ। কিন্তু বৃন্দাবনবাবু নিজেই তা জানেন না। আকাশের কবরের তলায় একা-একা স্বপ্ন দেখেন।

—বক্তৃতা কি শুনব? আমরা বক্তৃতা শুনেছি সুরেন বাঁড়ুয্যের।

সকালে চায়ের টেবিলে গল্প হচ্ছিল। চা খাওয়া হয়ে গেছে। বৃন্দাবনবাবুর ভণিতা শোনামাত্র পুত্র রমেশচন্দ্র ও পুত্রবধূ অপরাজিতা নিঃশব্দে উঠে গেল। রইলেন শুধু গৃহিণী কাদম্বিনী এবং পৌত্র অশোক।

পুরাকালের গল্প শুনতে অশোকের খুব ভালো লাগে।

জিজ্ঞাসা করলে, খুব ভালো বক্তৃতা দিতেন?

ছেলেমানুষের মুখেও এ কথাটা বৃন্দাবনবাবুর কাছে এমনই হাস্যকর মনে হল যে, তিনি হাস্যভরে গৃহিণীর দিকে চাইলেন। সেই হাসির মধ্যে কিছু অবজ্ঞা, কিছু কৌতুক। ভাবটা: শোন কথা! সুরেন বাঁড়ুয্যে ভালো বক্তৃতা দিতেন কি না, এও একটা প্রশ্ন!

বললেন, শোন্ বলি: লর্ড কার্জনের অহঙ্কার ছিল, তিনি খুব ভালো বক্তৃতা দেন। তাঁর মত বক্তৃতা আর কেউ দিতে পারে না। শুনতেন, সুরেনবাবুও ভালো বক্তৃতা দেন। ভাবতেন, কালা নেটিভ কত ভালো বক্তৃতাই বা দিতে পারে! শোনেন নি তো কখনও! একদিন সুযোগ ঘটে গেল।

চুরুটের ধোঁয়ার আড়ালে বৃন্দাবনবাবু সগৌরবে গৃহিণীর দিকে চাইলেন।

সাগ্রহে অশোক জিজ্ঞাসা করলে, তার পরে?

—এই কার্জন বসে, এই লেডী কার্জন।

পাশাপাশি দু খানা চেয়ার দেখিয়ে বৃন্দাবনবাবু লাটদম্পতির অবস্থান-নৈকট্য বুঝিয়ে দিলেন।

—সুরেনবাবু বক্তৃতা দিতে উঠলেন।

বৃন্দাবনবাবু নিবনো চুরুটটায় অগ্নিসংযোগ করতে লাগলেন

—তারপরে!—অশোক অধৈর্যের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলে।

বৃন্দাবনবাবু সংক্ষেপে বললেন, ফেরবার পথে লাটসাহেব আর মেমসাহেবের দিকে চাইতে পারেন না।

—কেন?—অশোক ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারলে না।

—শোন কথা, কেন? চাইবার মুখ আছে! স্বরেনবাবু যে কার্জনের চেয়েও বড় বক্তা, তা তো দুজনেই বুঝেছেন।

—আপনি সেই সভায় ছিলেন?

—ছিলাম না? এই স্বরেনবাবু, এই আমি! পাশাপাশি।

বৃন্দাবনবাবু আবার সগৌরবে কাদম্বিনীর দিকে চাইলেন।

—কী রকম বলতেন স্বরেনবাবু?—অশোক আবার জিজ্ঞাসা করলে।

—মৃদঙ্গ শুনেছিস?

অশোক ঘাড় নাড়লে।

—আচ্ছা, মেঘ ডাকা শুনিস নি?

—হ্যাঁ।

—তা হলেই তো স্বরেনবাবুর বক্তৃতা শুনেছিস।

—ওই রকম গলার আওয়াজ?

—অবিকল। মনে হত যেন মেঘ ডাকছে গুরু-গুরু। পাখোয়াজ বাজছে। সভায় যাবার জন্যে ডাকিস, যাব কোথায়? তোদের বক্তাদের মেয়েছেলের মত গলা। হাজার লোকের বৈঠকে মাইক্রোফোন দরকার হয়। আর বিশ হাজার লোকের সভায় তাঁরা বক্তৃতা দিতেন বিনা-মাইকে।

অতীত সম্বন্ধে অশোকের শুধু যে কৌতূহল আছে তাই নয়, প্রচুর শ্রদ্ধাও আছে।

ক্ষুণ্নকণ্ঠে বললে, মোটে বিশ হাজার!

বৃন্দাবনবাবু খবরের কাগজে পড়েছেন, এখনকার সভায় তিন-চার লক্ষ পর্যন্ত লোক হয়।

লজ্জিতকণ্ঠে বললেন, তখন লোক বেশী হত না যে। তা না হোক, আমাদের কালের বক্তাদের মত সে গলা, সে বাগ্মিতা এখন কোথায় পাবি? আগুন ছুটিয়ে দিতেন।

বৃন্দাবনবাবু আরও কিছু বলতেন হয়তো। কিন্তু চাকর এসে অশোককে জানালে, বাবু পড়তে যেতে বললেন। অশোক বিরক্তভাবে চলে গেল। গল্প ছেড়ে পড়তে যেতে তার মন ছিল না। বৃন্দাবনবাবুও নিঃশব্দে ক্ষুণ্নভাবে বসে রইলেন কিছুক্ষণ। তিনি বরাবর লক্ষ্য করেছেন, অশোকের সঙ্গে তাঁর

পুরনো কালের গল্প যখনই জমে ওঠে, তখনই তার পড়তে যাবার ডাক আসে।

চুরুটে আবার অগ্নিসংযোগ করে তিনি ছড়িটা তুলে নিয়ে বাগানে গেলেন। আর কাদম্বিনী দক্ষিণের বারান্দায় সেলাইটা নিয়ে গিয়ে বসলেন।

একালটাকে বৃন্দাবনবাবু কিছুতে বরদাস্ত করতে পারেন না। সেকালের তুলনায় একালের সব কিছুই তাঁর ছোট মনে হয়। এমন কী মানুষগুলোকে পর্যন্ত। তাঁর সমসাময়িক যাঁরা, একালের খ্যাতনামাদের তুলনায় তাঁদের দৈত্য বলে মনে হয়—বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, কর্মশক্তিতে সব দিকে।

একালকে তিনি বুঝতে পারেন না, বোঝবার চেষ্টাও করেন না। এরা যখন বলে, সেকালের চেয়ে চিন্তায় এরা অগ্রসর হয়ে গেছে, তিনি হাসেন।

অগ্রসর! হাঁ, অগ্রসর অবশ্য হয়েছে, কিন্তু জাহান্নামের দিকে।

তিনি হাসেন।

সকালের খবরের কাগজের সামনের পাতায় মস্ত বড় ছবিটার দিকে তাঁর দৃষ্টি পড়ল।

—ওটা কার ছবি হে?

অশোক উত্তর দিলে, রাজগোপালাচারীর।

—কী করেছেন তিনি?

—পশ্চিমবঙ্গের প্রদেশপাল হলেন।

—সেটা কী ব্যাপার?

—লাট সাহেব। আপনারা যাকে গভর্নর বলতেন।

বৃন্দাবনবাবু যেন আকস্মিক আঘাতে চমকে উঠলেন: লাট সাহেব! রাজগোপালাচারী! চটি পায়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতেন তো আগে?

অশোক নিরীহভাবে বললে, ছবিতে চটি পায়েই দেখা যাচ্ছে। কিন্তু তাতে দোষ কী হয়েছে দাদু?

—দোষ হয় নি?—চোখ পাকিয়ে বৃন্দাবনবাবু বললেন—ঘোরতর দোষ হয়েছে। লাট সাহেব যাকে-তাকে করলেই হল! মানান-সই বলে কথা নেই? একটা মর্যাদা নেই লাট সাহেবের? এই বুধিয়াকে পোশাক পরিয়ে রাজা সাজিয়ে দিলে মানাবে?

নম্রভাবে অশোক বললে, কিন্তু রাজগোপাল তো আর বুধিয়ার মত—

বাধা দিয়ে বৃন্দাবনবাবু বললেন, না। কিন্তু লাট সাহেবের মতও না।

তবু যদি বরোদার গাইকোয়াড়কে করা হত, কি পাতিয়ালার মাহারাজাকে, তা হলেও চলত। তা না, একেবারে চটি-পায়ে রাজগোপালকে! স্বাধীনতা পেয়ে এদের কি কাণ্ডজ্ঞান একেবারে লোপ পেয়েছে! ছিঃ!

ক্রোধে বৃন্দাবনবাবু কিছুক্ষণ হাঁপালেন। সেটা কেটে গেলে একেবারে বিগলিত কণ্ঠে বললেন, কী লাট সাহেবই দেখেছি! এই সেদিনও—রোনাল্ডসে, চেমস্‌ফোর্ড, লিটন…কী রং! কী চেহারা! দেখলে ভক্তিতে মাথা নুয়ে আসত।

অশোক বললে, রঙ আর হবে না কেন। ওরা যে সাহেব। ও-রকম ফরসা রঙ তো আমাদের দেশে হয় না।

—না হলে, বিলেত থেকে সাহেবই নিয়ে আসতে হবে। অন্তত লাট-সাহেব ক'টি। লাট বলে কথা। মানানো তো চাই বাপু। দরবার-হলে ঢোকবার আগে ভয়ে তালু শুকিয়ে যাবে, একটি গ্লাস জল খেতে হবে, তা না হলে লাট সাহেব!

বৃন্দাবনবাবু হাসতে লাগলেন।

অশোক বললে, কিন্তু আপনাদের কালেও দিশী লোক তো লাট সাহেব হয়েছেন।

—একটি। লর্ড সিংহ। ইংরেজ পরখ করে একবার দেখলে। চলল না। তৎক্ষণাৎ সরিয়ে দিলে। তৎক্ষণাৎ।

বলে বৃন্দাবনবাবু ডান হাত এমন ভঙ্গিতে প্রসারিত করলেন যে, মনে হল তিনিই লর্ড সিংহকে সরিয়ে দিলেন।

—কিন্তু লর্ড সিংহও তো মস্ত লোক ছিলেন।—অশোক বললে।

বৃন্দাবনবাবু তৎক্ষণাৎ বললেন, বাঘ।

—তবে?

অশোকের ছেলেমানুষিতে বৃন্দাবনবাবু এবার হেসে ফেললেন। বললেন, আরে বাপু, এঁরা হলেন মালদ'র জঙ্গলের গো-বাঘা। কিন্তু রয়াল বেঙ্গলের যে জাত আলাদা। তবে তাও বলি, তোমার এই রাজগোপালদের চেয়ে তাঁদের মানাত বেশী। তাঁরা অন্তত মূল্যবান স্যুট পরতেন। চটি পায়ে দিয়ে ঘুরে বেড়াতেন না। থাকতেনও প্রায় রাজ-রাজড়ার মতই। এঁদের চেয়ে ভালো।

পাশের ঘর থেকে অশোকের মায়ের কণ্ঠ শোনা গেল: সামনের সোমবার থেকে তোমার হাফ-ইয়ার্লি পরীক্ষা না অশোক?

—যাই মা।

অশোক চলে গেল। ক্ষুণ্ণভাবেই। এই গল্প ছেড়ে পড়তে বসতে মন লাগে না। কিন্তু তার চেয়ে বেশী মর্মাহত হলেন বৃন্দাবনবাবু নিজে। তাঁর-কালের কথা শোনবার লোকও ক্রমেই দুর্লভ হয়ে উঠছে। যাদের পরীক্ষা-পাস করার ঝামেলা চুকে গেছে, তারা অন্য কাজে ব্যস্ত। তাঁকে সম্ভবমত এড়িয়েই চলে। আর যারা এড়িয়ে চলে না, বলার মত করে বলতে পারলে যারা মনোযোগের সঙ্গে শোনে, তাদের ছ-মাস অন্তর পরীক্ষা, আর রোজ ক্লাসের পড়া। একটু যে বসে শুনবে, তার সময় নেই।

কী কালই পড়েছে!

বৃন্দাবনবাবুর ছোট শালীর ছেলে বিমল আসে মাঝে মাঝে তার মাসীর সঙ্গে দেখা করতে। ছেলেটি ভালো। এম, এ. পড়ছে। সামনে পড়ে গেলে বৃন্দাবনবাবু তাকে আটকান ঃ

—তোমার হাতে ওটা কী বই?

—কাব্য-সংকলন।

—সেটা কী ব্যাপার?

—আধুনিক বাংলা কবিদের লেখার একটা সংকলন।

—বাঁধাই তো চমৎকার হয়েছে! দেখি বইখানা।

মনের অপ্রসন্নতা চেপে রেখে বিমল বইখানা বৃন্দাবনবাবুর হাতে দেয়। ছ-টার মধ্যে যে বন্ধুটির বাড়ি যাওয়ার কথা ছিল, সেখানে যে যাওয়া হবে না, সে-বিষয়ে সে একরকম নিঃসংশয় হয়ে গেছে।

—হুঁ।

বৃন্দাবনবাবু মলাটটা কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করে যেন একটু খুশিই হলেন।

—এরকম বাঁধাই আমাদের দেশে এখন হচ্ছে? হুঁ।

বৃন্দাবনবাবু বইখানির পাতা ওল্টাতে লাগলেন।

> 'মায়াবী রাত্রির প্রতিশ্রুতি সখি, হয়তো রাখা আর
> হল না। বারো মাস তীব্র বৈশাখী ঢালিছে রুক্ষতা
> অভিপ্সার বীজ ছড়ানো প্রান্তরে; আকাশ-গঙ্গার
> বুক তো শুকু শুকু; ছিন্ন মেঘমালা, শ্রাবণী রূপকথা
> ভুলেছে রিম্‌ঝিম্ কাজরী মূর্ছনা।'

—মানেটা কী হল?—বৃন্দাবনবাবু যেন নিজেকেই প্রশ্ন করলেন—মায়াবী

রাত্রি, কাজরী মূর্ছনা, কী সর্বনাশ! এখন কি এই রকম করেই কবিতা লেখে নাকি হে?

—সবাই এক রকম তো লেখেন না।—বিমল বললে।

—না।

বৃন্দাবনবাবুর দৃষ্টি তখনও কবিতার পংক্তি কয়টির দিকে। মুখে মৃদু মৃদু কৌতুকময় হাসি।

বললেন, তোমাদের কালে আর এরকম কবিতা লেখা হয় না, না?

'সম্মুখ সমরে পড়ি, বীরচূড়ামণি
বীরবাহু, চলি যবে গেলা যমপুরে
অকালে, কহ, হে দেবি, অমৃতভাষিণি!
কোন্ বীরবরে বরি সেনাপতি-পদে
পাঠাইলা রণে পুনঃ রক্ষঃকুলনিধি
রাঘবারি?'

এ রকম আর লেখা হয় না, না?

বিমল নিঃশব্দে ঘাড় নাড়লে।

বৃন্দাবনবাবু বলতে লাগলেন: নবীন সেন ছিলেন বাবার বন্ধু। মাঝে মাঝে আসতেন আমাদের বাড়ি। নিজের মুখে নিজের কবিতা আবৃত্তি করতেন। এখনও যেন কানে বাজছে:

'কীর্তিনাশা!—কিবা নাম, কিবা অভিমান,
পার তুমি মানবের কি কীর্তি নাশিতে?
বঙ্গ-ইতিহাসের সে কাল-পৃষ্ঠা হতে
একটি অক্ষর তুমি পার কি মুছিতে?'

আহা! আবৃত্তি করতে করতে তিনি নিজেও উত্তেজিত হয়ে উঠতেন, পাশের ঘরে বসে আমাদেরও রোমাঞ্চ হত।

বিমল লক্ষ্য করলে, বৃন্দাবনবাবুর দেহ এতকাল পরে এখনও রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছে।

কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে থেকে বৃন্দাবনবাবু বললেন, এর নাম কবিতা, বুঝলে হে? কী ঢঙই রবি ঠাকুর আনলেন। আরম্ভ হল মিহি-মিহি নাকি সুরের মেয়েলী কবিতা। মায়াবী রাত্রি আর কাজরী মূর্ছনা! ছিঃ ছিঃ ছিঃ ছিঃ! বাংলা ভাষার মেরুদণ্ডটাই ভেঙে দিলে!

তারপর বললেন, হেমচন্দ্রকে বলা হত বাংলার মিল্‌টন, নবীন সেনকে বায়রন। এঁদের কী বল তোমরা?

—কিছুই বলি না। নিজের নামেই চলেন ওঁরা।

—তা ছাড়া উপায় কী বল? উপমা তো মিলবে না এঁদের! নিজেরাই নিজেদের উপমা! তোমাকে বলি বিমল, বাংলা বই যে খুব বেশী পড়তাম তা হয়তো নয়। আমাদের কালে ইংরেজী বই পড়ারই চল বেশী ছিল। তবু সময় পেলে মাঝে মাঝে পড়তাম। কিন্তু রবিবাবু কবিতা লিখতে আরম্ভ করার পর বাংলা পড়া একেবারেই ছেড়ে দিয়েছি।

এত বড় দুর্ঘটনাতেও বিমল কিন্তু খুব বিচলিত হল বলে বোধ হল না। বৃন্দাবনবাবুর কাছ থেকে নিষ্কৃতিলাভের জন্যে বললে, একবার ন' মাসীমা ডেকে পাঠিয়েছেন। সেখানে যেতে হবে এখুনি।

—তরলা? অনেক দিন আসে নি এদিকে! তার ছোট মেয়েটা নাকি নাচছে!

—খুব ভালো নাচে। এবারে অল-ইণ্ডিয়া কম্পিটিশনে ফার্স্ট হয়েছে।

—শুনেছি। কাগজে ছবিও দেখেছি। কিন্তু এসব কী ব্যাপার হে!

—কেন? এসব তো এখন চল হয়েছে। এখন তো—

বাধা দিয়ে বৃন্দাবনবাবু বললেন, জানি। নাচতে নাচতে ভদ্রঘরের মেয়েরা জাহান্নমে যাচ্ছে। মেয়েরা লেখাপড়া শিখছে, শিখুক। বিলেত যেতে চায়; যাক। এ সব আমি পছন্দই করি। কিন্তু নাচবে কি! ভদ্রঘরের মেয়ে! তরলাকে বলো এ আমি পছন্দ করি না। আমি খুব রেগেই গেছি এতে।

বলে ক্রোধভরে হনহন করে নিজের বসবার ঘরে চলে গেলেন।

সকালে চা-পানের পর বৃন্দাবনবাবু বাগানের দিকের বারান্দায় এসে বসলেন। অনেক কালের পুরনো বুড়ো মালী একটা ডালিয়া টিপয়ের উপর সসম্ভ্রমে নামিয়ে দিয়ে সেলাম করে দাঁড়াল।

এই তার প্রতিদিনের অভ্যাস।

প্রতিদিন সকালে বৃন্দাবনবাবু এইখানে এসে বসেন, বুড়ো মালী একটা ফুল দিয়ে সেলাম করে, দুজনে গল্প হয়। পুরনো কালের গল্প।

এই লোকটিই বৃন্দাবনবাবুর প্রকৃত শ্রোতা। প্রায় বৃন্দাবনবাবুরই সমবয়সী। তাঁর বাপের আমলের মালী। মালীর কাজ করতে আর পারে না। সে-কাজটা ওর ছেলে করে। কিন্তু ও রয়েই গেছে। কোথায়ই বা যাবে?

যৌবনে বৃন্দাবনবাবুর যা মেজাজ ছিল, ভয়ে ও কাছে আসতেই সাহস করত না। একদিন তিনি ওকে চাবুক পর্যন্ত মেরেছিলেন। এখন বৃন্দাবনবাবুর সেই সাহেবী মেজাজ নেই, মালীরও ভয় নেই। দুজনেই বেকার। সকালে প্রাণ খুলে দুজনে গল্প হয়। দেখা গেছে, দুজনেই অধিকাংশ বিষয়ে একমত। এমন কী, অনেক ক্ষেত্রে কাদম্বিনীর চেয়েও বুড়ো মালীর সঙ্গে তাঁর মতের মিল বেশী। কাদম্বিনীর চেয়েও সে ধৈর্যশীল শ্রোতা।

আজ সকালে বৃন্দাবনবাবুর মন ভালো নেই। তরলার মেয়েকে নিয়ে কাল রাত্রে তিনি অনেক ভেবেছেন। এবং যতই ভেবেছেন, ক্রোধ ততই বেড়েছে।

বুড়ো মালীকে দেখে সেই ক্রোধ আবার প্রবল হয়ে উঠল।

বললেন, দিন দিন দেশের অবস্থা কী যে হচ্ছে মালী, আর বেঁচে থাকতে ইচ্ছা করছে না।

উদ্বিগ্ন কণ্ঠে মালী জিজ্ঞাসা করলে, কী হয়েছে সাহেব?

—ভদ্রঘরের মেয়ে স্টেজে গিয়ে নাচ দেখাচ্ছে।

—নাচ!—গলা নামিয়ে মালী বললে, আমি যা দেখেছি, সে আর বলবার নয়।

—কী দেখেছিস?

আগের দিন হলে এ আলোচনা সাহেবের কাছে তুলতে সে প্রাণ গেলেও পারত না। কিন্তু এখন উভয়ের মধ্যে কেমন যেন একটা বন্ধুত্ব হয়েছে। যেমন বন্ধুত্ব দুটি অসমপদস্থ বাঙালীর মধ্যে কামস্কাটকায় গিয়ে হতে পারে।

সন্ত্রস্তভাবে এদিক-ওদিক চেয়ে মালী গলা নামিয়ে চট করে বলে ফেললে: সিগ্রেট পর্যন্ত খাচ্ছে।

বৃন্দাবনবাবু চমকে উঠলেন: কারা রে? মেয়েরা?

—হাঁ হুজুর। নিজের চোখে দেখেছি।

ফ্যাল ফ্যাল করে বৃন্দাবনবাবু ওর দিকে চেয়ে রইলেন। গলা দিয়ে একটা শব্দ পর্যন্ত বার হল না।

—শুনেছি, মদও চলছে। মালী আবার বললে।

—অ্যাঁ?

বৃন্দাবনবাবুর মাথা ঘুরতে লাগল।

এমন সময় কাদম্বিনী চুরুটের বাক্সটা এনে নিঃশব্দে টিপয়ের উপর রাখলেন।

—শুনেছ?

বৃন্দাবনবাবুর মুখের দিকে চেয়ে কাদম্বিনী সভয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কি

—মেয়েরা পর্যন্ত নাকি সিগারেট খাচ্ছে। এমন কী, মদ পর্যন্ত—

লজ্জায় বৃন্দাবনবাবু বাক্যটি আর শেষ করতে পারলেন না।

আশ্বস্তভাবে কাদম্বিনী পাশের চেয়ারটায় বসে মালীকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার শরীর তো খুব ভালো বোধ হচ্ছে না মালী।

মালী বুঝলে, মেমসাহেব এ আলোচনায় তাকে অংশ গ্রহণ করতে দিতে চান না। কোন মতে প্রশ্নটার জবাব দিয়ে ধীরে ধীরে সে সরে গেল।

তখন হেসে কাদম্বিনী জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কার কাছে এসব কথা শুনলে?

—মালীর কাছে। নিজের চোখে দেখেছে। মিথ্যে কথা বলবার লোক নয় সে।

—না। কিন্তু খুব সত্যি কথাও নয়।

—কেন?

কাদম্বিনী হেসে বললেন, তোমরা যখন মদ-মুর্গী খেতে আরম্ভ করেছিলে, বাংলা দেশের বুড়োরা তখন তোমারই মত শিউরে উঠে বলেছিলেন: এখনকার ছেলেরা মদ-মুর্গী খাচ্ছে, জাত-ধর্ম আর রইল না। বলেন নি?

সে সব কথা বৃন্দাবনবাবুর এখনও স্পষ্ট মনে পড়ে। হেসে বললেন, বলেছিলেন।

—মিথ্যে কিছু বলেন নি?

—না।

—কিন্তু সত্যিও নয়।

—কেন?

—কারণ ক'জন তোমরা মদ-মুর্গী খেতে? আঙুলে গোনা যায় তাদের। অথচ, আতঙ্কে বিভ্রান্ত হয়ে জনকয়েক ছেলের অনাচার তাঁরা গোটা বাংলা দেশের ছেলেদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছিলেন, নয় কি?

বৃন্দাবনবাবুকে স্বীকার করতে হল।

কাদম্বিনী বললেন, এও তাই। হয়তো কোন মেয়ে সন্ধ্যার পরে লেকের ধারে একটা সিগারেট খেয়েছে, কিংবা হয়তো মদও একটু-আধটু—

বাধা দিয়ে বৃন্দাবনবাবু বললেন, তুমি তাকে মন্দ বল না?

—বলি। কিন্তু তার জন্যে বাংলাদেশের দিকে চেয়ে ভয় পাবার কিছু নেই। তোমার কথা ওরা বোঝে না, ওদের কথাও আমরা বুঝি না। আসলে আমাদের কা করা উচিত জান?

—কী ?

—কাশী চলে যাওয়া। কিন্তু তুমি তো কিছুতেই ঠাকুর-দেবতা মানতে পারলে না।

এবার বৃন্দাবনবাবু হো-হো করে হেসে উঠলেন। বললেন, এরই নাম স্ত্রীবুদ্ধি।

—কেন ?

—ঠাকুর-দেবতা না মানতে পারলেও ধর কাশী গেলাম। কিন্তু কাশী কি ভারতের বাইরে ? সেখানে ছেলে-মেয়ে নেই ? এই হাওয়া বাবা বিশ্বনাথের ভয়ে সেখানে কি পৌঁছয় নি ?

—তা হলে ? আর কী করার আছে ?

—অনেক কিছু করার আছে।—বৃন্দাবনবাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, আমাদের সেই সোনার যুগ, যার মধ্যে আমরা জন্মেছি, বড় হয়েছি, যাকে আমরা রূপ দিয়েছি, শ্রদ্ধা করেছি, প্রত্যেকটি রক্তকণা দিয়ে ভালবেসেছি—তাকে এরা গায়ের জোরে গলা টিপে মারতে চলেছে। আমরা সমস্ত শক্তি দিয়ে একে বাধা দেব। আমি আজকেই তরলার বাড়ি যাব।

—কেন ?

—তার মেয়েকে সে নাচ শেখাচ্ছে, আমি বাধা দেব।

—বাধা দেবে ? কিন্তু তোমার নিজের নাতনী সন্ধ্যেবেলায় কোথায় যায় খবর রাখ ?

—কোথায় ?

—নাচ শিখতে। গন্ধর্ব বিদ্যালয়ে।

—বল কী ?

—হ্যাঁ।

বৃন্দাবনবাবু ধীরে ধীরে চেয়ারটায় বসে পড়লেন।

সেই দিন অপরাহ্ণেই বৃন্দাবনবাবু মারা গেলেন।

কী যে হয়েছিল, সে বিষয়ে ডাক্তারদের মধ্যে মতভেদ আছে। রক্তচাপ, সন্ন্যাস, করোনারি থ্রম্বসিস এক-একজন এক-একরকম অভিমত প্রকাশ করলেন। কিন্তু সে যাই হোক, বয়স হয়েছিল ছিয়াশী। সুতরাং অকালমৃত্যু কিছুতেই বলা যায় না।

কাদম্বিনী পাকা চুলে সিঁথিতে জলজলে সিঁদুর পরে স্তব্ধভাবে বসে রইলেন। এগারো বছর বয়সে তাঁর বিবাহ হয়েছিল। সেই থেকে এই সাতাত্তর বৎসর

বয়স পর্যন্ত দুজনের মধ্যে কচিৎ ছাড়াছাড়ি হয়েছে। এই ছেষট্টি বৎসরের কত ভাব, কত কলহ, কত আনন্দবেদনার স্মৃতি ছায়াছবির মত তাঁর চোখের সামনে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, তার নিগূঢ়তা তিনি ছাড়া আর কেউ জানে না।

আর মনে হল, আঘাত পেয়েছে অশোক। তার একমাত্র খেলার সাথী হারিয়ে গেল। এই পরিবারে ওই একমাত্র ব্যক্তি, বয়সের প্রকাণ্ড ব্যবধান সত্ত্বেও যিনি ছিলেন তারই সমবয়সী। যিনি কখনও পড়তে বলতেন না, দোষ দেখলে তিরস্কার করতেন না, শুধু পুরনো কালের মজার মজার গল্প বলতেন।

অশোক মুষড়ে গেল।

ঠাকমার কাছে, বুড়ো মালীর কাছে টুকরা টাকরো যেটুকু সে শুনেছে, তার মনে হল, একালের উপর রাগ করেই তিনি চলে গেলেন। তার ফলে তার শিশুমন একালের উপর প্রসন্ন হল না।

তাকে সান্ত্বনা দিলে তার দিদি, যেটি কলেজে পড়ে আর গন্ধর্ব বিদ্যালয়ে নাচ শেখে।

বললে, দাদু অনেক দিন আগেই মারা গেছেন রে। তাঁর কালের সঙ্গে সঙ্গে তাঁরও মৃত্যু হয়েছিল। আমরাও টের পাই নি, তিনি নিজেও টের পান নি। দুঃখ করিস না, উনি ভালোই গেছেন। একালের আকাশে উনি নিঃশ্বাস নিতে পারছিলেন না। ওঁর কষ্ট হচ্ছিল।

—কেন এমন হয়?

—সময়ের সঙ্গে সঙ্গে যাঁরা বাড়তে পারেন না, তাঁদের সবারই এমনি কষ্ট হয়।

সমারোহ যথেষ্ট হল। বৃন্দাবনবাবু নিজে কৃতী লোক ছিলেন। পুত্রও কৃতী। খাট এল, রাশি রাশি ফুল এল। কত লোকজন এল। সব শেষে এল বুড়ো মালী। তার হাতে একটি ডালিয়ার গুচ্ছ। সাহেবকে তার শেষ উপহার সে নিঃশব্দে দিয়ে গেল।

সে রাত্রি এবং তার পরের সমস্ত দিন কেউ তার দেখা পেলে না। কেউ তার খোঁজও করে নি অবশ্য। সন্ধ্যাবেলায় কাদম্বিনী যখন তাঁর শোবার ঘরের মেঝেয় একখানা কম্বল বিছিয়ে জড়োসড়ো হয়ে শুয়ে, তখন সে এসে দাঁড়াল।

—মেমসাব!

—কে রে?—ক্ষীণ কণ্ঠে কাদম্বিনী জিজ্ঞাসা করলেন।

—আমি মালী হুজুর।

বুড়ো মালী সামনে এসে দাঁড়াল। কাদম্বিনী চোখ মেলে চাইলেন।

—দেশে চললাম মেমসাব।

—দেশে! সেখানে তোমার কে আছে?

—ঠিক জানি নে হুজুর। গেলে বুঝতে পারব।

কাদম্বিনী নিঃশব্দে ওর দিকে চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ; তারপর বললেন, তোমার সাহেবই চলে গেলেন মালী। কিন্তু আমি তো রইলাম। বেশীদিন থাকব না অবশ্য; সেই কটা দিন—

—কি জানেন, অনেক কাল আগে সাহেব রেগে একদিন চাবুক মেরেছিলেন, সে দাগটা কবে মিলিয়ে গেছে, কিন্তু এতকাল পরে জায়গাটা আবার জ্বালা করছে, সোয়াস্তি পাচ্ছি না। তাই ভাবছিলাম···তা ঠিক আছে হুজুর; আমিও রইলাম। আমারই বা আর ক'টা দিন!

ফোকলা দাঁত বের করে মালীটা হাসতে লাগল।

॥ রুকমিনি ॥

রামখেলাওনের একটি গাধা ছিল। গাধা শুধু যে মোট বইত তাই নয়, তার ধোবীখানার বিজ্ঞাপনের কাজও করত। ভগবান গাধাদের কণ্ঠ দিয়াছেন— অতিবড় নাস্তিকের পক্ষেও তার অস্তিত্বকে অস্বীকার করা অসম্ভব। গাধা ডাকত—সকালে, দুপুরে, বিকেলে, সন্ধ্যায়, গভীর নিষুতি রাত্রে যখনই ইচ্ছে হত, ডাকত। তার ফলে যারা তাকে চোখেও দেখে নি তাদের সঙ্গে তার অস্তিত্বের প্রত্যক্ষ পরিচয় হত, দর্শনেন্দ্রিয়ের মারফত যদিচ নয়, শ্রবণেন্দ্রিয়ের মারফত। কারণ তার সেই সঙ্গীত 'কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিত' বললেও অত্যুক্তি করা হয় না।

এইভাবেই গাধা রামখেলাওনের ধোবীখানার বিজ্ঞাপনের কাজ করত। তার কণ্ঠস্বরে তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে যখন লোকে নিঃসন্দেহ হত তখন 'ধূমাৎ বহ্নিঃ' এই সূত্র অনুসারে তারই সন্নিকটে একটি ধোবীখানার অস্তিত্ব কল্পনা করাই স্বাভাবিক। গাধাদের একটা মস্ত বড় সুবিধা এই যে, জন্মের পর প্রথম দু-তিনটে বছর কোন রকমে পার করতে পারলে তারা কালের সীমানা পার হয়ে যায়। তখন তাদের দেহে এমন একটি নির্বেদ তপঃক্লিষ্টতা এবং মুখমণ্ডলে এমন একটি অমায়িক শূন্যবাদ আবির্ভূত হয় যে, তার বয়স নির্ণয় করা দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। কোনটা তরুণ, কোনটা প্রধান, কোনটা যুবক, কোনটা প্রৌঢ়, কোনটা বৃদ্ধ বলে কার সাধ্য? বস্তুত যে জানে না যে, এই গাধাটার নাম রুকমিনি, তার পক্ষে দূর থেকে ঠাহর করাই কঠিন হবে গাধাটা কোন জাতীয়, পুরুষ না স্ত্রী।

রামখেলাওনের হাতে রুকমিনি প্রহার নিতান্ত সামান্য খায় না। কিন্তু তার মানে এ নয় যে রুকমিনিকে সে স্নেহ করে না। স্নেহ যে করে তার বড় প্রমাণ এই যে, তার নাম রেখেছে রুকমিনি। কিন্তু আসল কথা এই যে, রামখেলাওনের মত লোকদের হাতে (অনেক সময় রামখেলাওনদের চেয়ে অনেক বড় লোকদের হাতে) বিয়ে-করা মানবী রুক্মিণীদেরও পুরনো হয়ে গেলে যে দুর্দশা ঘটে, গর্দভী রুকমিনিরও তাই ঘটে থাকে।

অর্থাৎ ব্যাপারটা নিতান্তই ভুল বোঝাবুঝির জন্যে। রুকমিনি যে মোটটা ঘাটে নিয়ে যায় আর নিয়ে আসে, তার চেয়ে দ্বিগুণ বলশালী কোন জন্তুর

পক্ষেও তা বয়ে নিয়ে যাওয়া দুষ্কর। এর জন্যে রুকমিনির কাছে রামখেলাওনের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত বলেই রুকমিনির ধারণা।

পক্ষান্তরে রামখেলোওন ভাবে, রুকমিনি আর এমন কী করে! মোটটা কোনোমতে ঘাটে নামিয়ে দিয়েই রুকমিনি খালাস। তারপরে তার সামনের দুই পায়ে দড়ি বেঁধে দিলেই সে লাফিয়ে লাফিয়ে সমস্ত দিন ঘাস খেয়ে বেড়াবে। আর সে তখন ওই পর্বত-প্রমাণ কাপড়ের বোঝা সমস্ত দিন ধরে পাটায় আছড়াবে, সেগুলো গুণে হিসাব মেলাবে, মোট বাঁধবে, রুকমিনির পিঠে চড়াবে আর তারপরে কোথা-থেকে-কোথা দীর্ঘ একটা পথ মন্থরগতি গাধার পিছু পিছু ধুলো খেতে খেতে হেঁটে ফিরবে।

এর পরে রাত্রে যখন তার দেহ ভেঙে আসবে ক্লান্তিতে, চোখে রাজ্যের ঘুম এসে একটা বোঝার মত চাপবে, তখন যদি রুকমিনি হঠাৎ চীৎকারে পাড়া মাথায় করে, আর তাহলে সে যদি পাশের পাঁচনটা তুলে এলোপাথারি মারতে থাকে, সেটা এমন কী অপরাধ?

তার ধারণা, সমস্তটাই রুকমিনির বেয়াদবি বদমাইশী। পাশে রামখেলাওনকে অঘোরে ঘুমুতে দেখে ইচ্ছা করেই সে অমনি চিৎকার করে।

রুকমিনি মার খেয়ে ধোঁকে। উপকারী জন্তুদের সম্বন্ধে মানুষের অকৃতজ্ঞতায় সে একটা দার্শনিক বেদনা অনুভব করে। সে জানে, রামখেলাওনের ঘুম ভাঙাবার কোন অসদভিপ্রায় তার ছিল না; মনিবের উপর তার প্রীতি শ্রদ্ধার অভাব নেই; আসলে সে চিৎকার করে অধিকাংশ দিনই ক্ষুধার যন্ত্রণায়। জন্তুটা আকারে ছোট বলে তার জঠরের আয়তন সম্বন্ধে রামখেলাওনের একটা ভ্রান্ত ধারণা আছে। তার বিশ্বাস দু-আঁটি খড় ফেলে দিলেই এই ক্ষুদ্রকায় কৃশ জন্তুটার জঠরানল নির্বাপিত হবে। এই ভ্রান্তি দূর করবার জন্যেই রুকমিনিকে প্রায়ই তার স্বরযন্ত্রের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করতে হয়।

অবশ্য এর ব্যতিক্রমও আছে, কিন্তু সে কদাচিৎ ঘটে। চাঁদের আলো রামখেলাওনদের বস্তিতে নিতান্তই দুর্লভ বস্তু। ক্বচিৎ কখনও বস্তির যে অন্ধকার ছায়াচ্ছন্ন অংশে, কি শীতে কি গ্রীষ্মে, রুকমিনি রাত্রি যাপন করে, সেখানে রোমন্থনের অবকাশে হঠাৎ এক-এক দিন রুকমিনির মুদ্রিত আঁখিপল্লবে কিসের যেন টান বাজে। চোখ মেলে দেখে, দূরে দত্তবাবুদের বাগানে নারিকেলগাছের অন্তরালে নীল আকাশের কোলে পীতোজ্জ্বল চাঁদ উঠেছে। কিছুই না বুঝেও রুকমিনির যৌবন-জল-তরঙ্গে হঠাৎ জোয়ার আসে। আত্মহারা হয়ে সে গান গেয়ে ওঠে।

রামখেলাওন বোঝে না, ওটা চিৎকার নয়, ওর উদ্দেশ্যও তার নিদ্রাভঙ্গ করা নয়—ওটা সঙ্গীত। মারের চোটে তার চমক ভাঙে, মনে দুঃখ হয়। কিন্তু যৌবন-জল-তরঙ্গের ব্যাপারটা বাইরের লোককে বোঝানো যায় না। শুধু যতক্ষণ প্রহারের যন্ত্রণায় ঘুম না আসে ততক্ষণ শুষ্ক তৃণের সঙ্গে এই অপ্রকাশিতব্য আনন্দটুকু নিজের মনেই রোমন্থন করে চলে।

এই ভাবেই দিন চলে, অবিরত অসহ্য অশান্তি-কলহের মধ্যেও দম্পতির দিন যেমন করে চলে।

রুকমিনিকে রামখেলাওন মূল্য দিয়ে কিনেছে, মূল্য নিয়ে অন্য কাউকে বেচে দিতেও পারে নিশ্চয়ই। কিন্তু ওই যে বলেছি, দেনা-পাওনার হিসাব ছাড়াও দীর্ঘকালের সাহচর্যে পরস্পরের মধ্যে একটা স্নেহ-প্রীতির সম্পর্কও তো গড়ে উঠেছে! রুকমিনি খুব এক চোট মার খাওয়ার পরে মাঝে মাঝে ঘাট থেকে পা-বাঁধা অবস্থাতেই যাবে একদিন পালিয়ে। সে তো আর বসে বসে খায় না—গতর খাটিয়ে খায়। সুতরাং যেখানে খাটবে, দুটো খড়-বিচালি সেখানেই জুটবে। পরে প্রহারের যন্ত্রণার একটু উপশম হলেই আবার ভাবে, নতুন মনিব যে এর চেয়ে বেশী অত্যাচারী হবে না তাই বা কে জানে!

এই অবস্থায় একদিন সে প্রচণ্ড মার খেলে। এমন মার সে কখনও খায় নি। রামখেলাওন সেদিন মদ খেয়েছিল প্রচুর। রুকমিনির অপরাধ খুবই গুরুতর। ক্ষুধার তাড়নায় সে একখানা মূল্যবান শাড়ির কিছুটা চিবিয়ে ফেলেছিল। ক্রোধে এবং মদে উন্মত্ত রামখেলাওন এমন মারলে যে রুকমিনির একটা পা গেল ভেঙে।

মেরে বীরদর্পে রামখেলাওন গেল শুতে, আর রুকমিনি পিছন দিকের সেই অন্ধকার ছাঁচতলায় পড়ে পড়ে সারারাত কাতরাতে লাগল।

সকালবেলায় যখন রামখেলাওনের ক্রোধ এবং মদ দুয়েরই নেশা ছুটে গেল, তখন রুকমিনির অবস্থা দেখে তার খুবই দুঃখ হল। সুমুখের দিকের ডান পা'টা বেশ জখম হয়েছে। কয়েক দিন সে যে কাজ করতে পারবে তার আর সম্ভাবনা নেই।

তার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে রামখেলাওন সখেদে বললে, তুই যে বড় বেইমানি করিস রে রুকমিনি, তাই তো তোকে মারি! দামী কাপড়খানার কী করেছিস বল্ দেখি! মাঈজী লোক যে কী রকম জানিস না, হয়তো শাড়িখানা নিতেই চাইবে না। কাটা শাড়ি কেই বা নিতে চায় বল্! তখন

যদি আমার কাছে খেসারত চেয়ে বসে, আমি গরিব আদমী, কোথা থেকে দেব বল্ দিকি ?

রুকমিনি অভিমানে তার দিকে চাইলে না। তার ভাবলেশহীন চোখের কোণ বেয়ে দু ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল।

তা দেখে রামখেলাওনের খুব কষ্ট হল। বললে, যাক গে, যা করেছিস করেছিস, আর অমন করিস না কখনও।

দু আঁটি খড় এনে সে ছড়িয়ে দিলে ওর মুখের সামনে। জঠরের যন্ত্রণা বড় কঠিন যন্ত্রণা। সমস্ত রাত্রি অনশনের পর দু আঁটি শুকনো খড় পেয়ে প্রহারের যন্ত্রণা ভুলে রুকমিনি উঠতে যাচ্ছিল। কিন্তু ভাঙা পা। তখনই ফের পড়ে গেল এবং রামখেলাওনের দিকে একটা তিরস্কারপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে নিঃশব্দে পড়ে রইল। ভাবটা, কী করেছ বল দিকি ? এমনি করে মারে !

রামখেলাওন বুঝলে সেই দৃষ্টির অর্থ। একটু লজ্জাও পেলে বোধ করি। অনুতপ্ত কণ্ঠে বললে, আহা রে ! বড্ড ভুখ লেগেছিল তোর ! তাই বলে শাড়ি কি খায় রে বোকা ? তবে আর তোদের গাধা বলেছে কেন ?

খড়গুলো ওর মুখের কাছে এগিয়ে দিতে দিতে বললে, বড় বেশী মারটা হয়ে গেছে, না রে ? কেন কসুর করিস বল্ তো ? জানিস তো আমার রাগ চণ্ডাল। রাগলে আমার কোন জ্ঞান থাকে না। খা, খা, ধীরে ধীরে খা। আরও খড় দেব।

একটু পরে আবার বললে, এ দুদিন আর ঘাটে যাব না। দুদিন একটু জিরিয়ে নে। আমি বরং জামা-কাপড়গুলো ইস্ত্রি করে দিয়ে আসি।

রুকমিনির অবস্থা দেখে তার মনটা ভারী হয়ে গেল।

ঘোষেদের বাড়িতে একদল ছেলে জটলা করে হৈ-হৈ করছে, এমন সময় রামখেলাওন এসে কাপড়ের মোটটা নামালে। ডাকলে, মাঈজি !

ছেলেদের মধ্যে একজন হাতের রসিদ-বইখানা আন্দোলিত করে ওর কাছে ছুটে এল। বললে, রামখেলাওন, লটারির টিকিট কিনবে ?

লটারির টিকিট কী, রামখেলাওন জানে না। ভাবলে একটা হাসির কোন ব্যাপার। এ বাড়িতে সে কাপড় ধুচ্ছে বহুকাল। ছেলেরা রসিকতাও করে তার সঙ্গে।

হেসে বললে, লেব।

—টাকা লাগবে চারটে।

টাকার নাম শুনে রামখেলাওন পিছিয়ে গেল। বললে, নেহি বাবুজি, রুপেয়া খরচ করে তামাশার মধ্যে আমি নেই।

কিন্তু ছেলেরাও ছাড়বে না। এই একখানা টিকিট বিক্রি করতে পারলেই তাদের পঁচিশখানা বিক্রি হয়ে যায়। তা থেকে একখানা টিকিট ফাউ পাবে। তারা সমবেতভাবে বোঝাতে বসল, লটারির মানে কী, মাত্র চার টাকা দিয়ে একখানা টিকিট কেটে নসীব ফিরে যেতে পারে। কত লোকের নসীব ফিরে গেছে, তাদের নাম-ধাম শোনালে।

রামখেলাওন ধীরে ধীরে লোভার্ত হতে লাগল। অত টাকা! কার নসীবে কী আছে, কে বলতে পারে? আর কিছুক্ষণ বোঝাতে রামখেলাওন রাজী হয়ে গেল।

ছেলেরা মহানন্দে নাম-ঠিকানা লিখতে লাগল। অবশেষে জিজ্ঞাসা করলে, ছদ্মনাম কী লিখব বল?

ছদ্মনাম আবার কী? রামখেলাওন তার নিজের পিতৃদত্ত নামটাই জানে. আর কিছু জানে না।

ছেলেরা ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিতে সে প্রথমটা একগাল হাসলে। রুকমিনিকে ওই রকমভাবে মারবার পর এই প্রথম সে প্রাণ খুলে হাসলে।

বললে, লিখ্ দিজিয়ে রুকমিনি।

ঘোষ-গিন্নী হেসে বললেন, বউমার নাম বুঝি?

রামখেলাওন সলজ্জ হেসে উত্তর দিলে, নেহি মাঈজী। মেরা বেটীকা নাম।

ঘোষ-গিন্নী আর কিছু বললেন না।

এর কিছুদিন পরে।

রুকমিনি অনেকটা সেরে গেছে বটে, কিন্তু এখনও খোঁড়ায়। সেই অবস্থাতেই কোন রকমে ঘাটে মোটও নিয়ে যায়।

তখনও ভোর হয় নি। ঈষৎ অন্ধকার আছে। রুকমিনি তৈয়ার। রামখেলাওন তার পিঠে চড়াবার জন্যে কাপড়গুলো গুনে গুছিয়ে বিরাট এক মোট বাঁধছিল। এমন সময় হাঁটু পর্যন্ত কাপড়-ওঠানো, মাথায় মলিন পাগড়ি এক মাড়োয়ারী এসে উপস্থিত।

জিজ্ঞাসা করলে, আপকা নাম রামখেলাওনবাবু?

রামখেলাওন সবিস্ময়ে তার দিকে চাইলে। সম্পূর্ণ অপরিচিত একটি লোক। কিন্তু জীবনে এই প্রথম একজন লোক তাকে সসম্ভ্রমে সম্বোধন করলে।

খুশী হয়ে সেলাম করে রামখেলাওন জবাব দিলে, হাঁ জী।

লোকটি জিজ্ঞাসা করলে, আপনি একটা লটারির টিকস্ কিনেছেন?

—লটারির টিকস্? হাঁ হাঁ। সে তো অনেক দিনের কথা।

—ঠিক আছে। ওটা আপনি বেচবেন?

—বেচব? কেন?—রামখেলাওনের মোটের বাঁধন ঢিলা হয়ে গেল। তার বিস্ময়ের আর শেষ নেই।

—আমি কিনতে পারি। হাজার রুপেয়া।

হাজার রুপেয়া! পাঁচ কুড়ির বেশী টাকা রামখেলাওন এক সঙ্গে চোখে দেখে নি। তার চোখ কপালে উঠল।

স্খলিতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে, কিনে আপনি কী করবেন?

—দরকার আছে।

ধোপা হলে কী হয়, মাড়োয়ারীর প্রশ্নে তার ব্যবসায়বুদ্ধি হঠাৎ চাড়া দিয়ে উঠল।

করজোড়ে জানালে, নেহি বাবুজী।

বাবুজী কিন্তু এত সহজে ছাড়বার পাত্র নয়। হাজার থেকে বারো শো, বারো থেকে দেড় হাজার, অবশেষে এক ঘণ্টা কচলাকচলি করার পর সে বাঁ হাতের উপর ডান হাতের একটা তালি দিয়ে বললে, ষোলো শও। ব্যস্।

কিন্তু রামখেলাওনের মাথায় সেই যা একটা সন্দেহ এসেছে সে আর যায় না। রাত থাকতে খুঁজে খুঁজে এই যে মাড়োয়ারী তার এঁদো গলির বস্তিতে এসে হাজির হয়েছে, এর পিছনে নিশ্চয় কোন মতলব আছে। খোকাবাবুদের জিজ্ঞাসা না করে এ বিষয়ে কিছু ঠিক করা হবে না।

সুতরাং তার সেই যে এক জবাব 'নেহি বাবুজী', তার আর পরিবর্তন হল না। মাড়োয়ারী সহজে ছাড়বার পাত্র নয়। আরও কিছুক্ষণ সে রামখেলাওনের মস্তিষ্কে শুভবুদ্ধি উদ্রেক করার জন্যে চেষ্টা করল। ষোলো শও টাকা যে অনেক টাকা—এই টাকা পেলে তাকে যে আর বাকি জীবনে মেহনত করে খেতে হবে না—তাও বোঝালে।

অবশেষে হতাশ হয়ে চলে গেল।

চলে যাবার পরে রামখেলাওন অনেকক্ষণ গালে হাত দিয়ে ঝিম হয়ে বসে রইল। হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলে দেওয়া ঠিক হল কি না, সন্দেহ জাগল। একবার মনে হল, মাড়োয়ারী বাবুজীকে ছুটে গিয়ে ডেকে নিয়ে আসে। কিন্তু তার পা যেন মাটির সঙ্গে আবদ্ধ হয়ে গেছে। সে আর নড়তে পারছে না।

হঠাৎ খেয়াল হল, যে-টিকস্‌টা নিয়ে এত কাণ্ড সেটা কোথায় ?

রামখেলাওন ছুটল তার ঘরের ভিতর। ঘরে তার বাক্স-প্যাটরার বালাই নেই। কেবল হাঁড়িকুঁড়ি। তার মধ্যে চাল থাকে, আটা থাকে, ডাল থাকে, নুন থাকে—কোনটাতে দু-চারটে আলু-পটলও থাকে। তার যা-কিছু টাকা-পয়সা সে ওই চাল-ডালের ভিতরই হাঁড়িতে-ছাঁড়িতে ছড়িয়ে থাকে। সেইগুলো সে ব্যস্তভাবে খুঁজতে লাগল।

কিন্তু কোনটাতেই তার চিহ্নমাত্র পেলে না।

সর্বনাশ! তার মাথায় যেন বাজ ভেঙে পড়ল। টিকিট যদি না পাওয়া যায়···ষোলো শো টাকা, না কে জানে কত শো টাকা···সবই বরবাদ!

রামখেলাওন চোখে অন্ধকার দেখলে।

গতকাল দাঁতনের জন্য কী একটা গাছের ডাল সে পথ থেকে ভেঙে এনেছিল। তার পাতাগুলোও ফেলে দেওয়া হয় নি। চালের বাতায় গোঁজা সেই ডালের দিকে রুকমিনির দৃষ্টি পড়েছে। সামনের দুটো পা দেওয়ালে দিয়ে সেই পাতাগুলো খাবার চেষ্টায় সে মুখ তুলেছে। রুকমিনির পেট আর কিছুতে ভরে না। একে টিকিট হারিয়ে রামখেলাওনের মেজাজ খারাপ, তার উপর রুকমিনির এই লোলুপতা দেখে তাকে আবার এক প্রস্থ প্রহারের জন্যে সে লাঠিটার দিকে হাত বাড়াবে, এমন সময় এক সেকেণ্ডের ভগ্নাংশকাল মধ্যে তার মস্তিষ্কে কী যেন একটা তড়িৎপ্রবাহ বয়ে গেল, সে ছিটকে গিয়ে পৌছুল সেইখানে।

খোঁড়া রুকমিনি চমকে ভয় পেয়ে সরে আসতে গিয়ে দুম করে উঠানে চিৎপটাং হয়ে পড়ে গেল। আর রামখেলাওন বাতার সেইখানে হাত পুরে এক টুকরো কাগজ বের করে নাচতে আরম্ভ করলে—প্রথমে দাওয়ায়, তারপরে উঠানে। এবং তারপরে রুকমিনির গলা জড়িয়ে ধরে সে কাঁদতে লাগল, না হাসতে লাগল, না আদর করতে লাগল, তা বোঝে কার সাধ্য!

রামখেলাওন লটারিতে যে টাকাটা পেল, তার পরিমাণ চল্লিশ হাজারের ওপর। সুতরাং তার বাড়িতে কয়েকদিন ধরে অসংখ্য আত্মীয়-কুটুম্বের ভিড় জমতে লাগল। প্রথমে তার যত নিকট আত্মীয়, তারপরে দূর আত্মীয় ও গ্রামের লোক, তারপর জেলার লোক। সকাল, দুপুর, সন্ধ্যা—লোকের আসা-যাওয়ার আর বিরাম নেই। ছিলমের পর ছিলম তামাক, যারা গাঁজা খায় তাদের জন্যে গাঁজা, তার সঙ্গে মিঠাই, চলছেই। এই সমস্ত বস্তুর প্রসাদে তাদের মুখে রামখেলাওনের শিশুকাল থেকে এ পর্যন্ত যাবতীয় গুণাবলীর

ফিরিস্তি যেন জপমালার মত ঘুরে বেড়াতে লাগল। এত গুণ যে তার ছিল, তা সে নিজেই জানত না।

এদিকে রুকমিনি বেচারার দুঃখের আর শেষ নেই। তার সেই ভাঙা হাঁটুটা আর কয়েকদিন বিশ্রাম পেলে হয়তো ঠিক হয়ে যেত। কিন্তু তা তো আর পেলে না। দু দিন যেতে-না-যেতেই আবার তাকে মোট বইতে হয়েছে। ফলে, ব্যথাটা টাটিয়ে তাকে আবার শুইয়ে ফেলেছে। ভাগ্যিস্ লটারির কল্যাণে রামখেলাওনের ঘাটে যাওয়া ক'দিন বন্ধ আছে, নইলে হয়তো এই ব্যথা নিয়েই তাকে মোট বয়ে ঘাটে যেতে হত।

রামখেলাওনের কিন্তু তার দিকে লক্ষ্য করবার সময়ই নেই। লটারির টাকা পেয়ে একে তো তার মন ভরে আছে। (বস্তুত চল্লিশ হাজার টাকা যে ঠিক কত টাকা সে বিষয়ে তার স্পষ্ট কোনও ধারণাই নেই।) তার উপর সব সময় লোকের ভিড়ে তার ছোট্ট আস্তানা যেন বিয়ে-বাড়ি হয়ে উঠেছে।

এই সমারোহের মধ্যে রুকমিনির কথা ভাববার সময় কোথায়?

এর উপর তার আত্মীয়েরা ধরেছে, সোমবার তাদের মদ খাওয়াতে হবে।

এই সামান্য অনুরোধে সে 'না' বলবে কী করে? সুতরাং রুকমিনি যখন যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে, সে তখন মনের উৎসাহে তারই যোগাড়ে ব্যস্ত। তারও ঝামেলা কম নয়। সকলেই তার স্বজাতি নয়, আত্মীয়ও নয়, তাদের গ্রামের কয়েকজন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ও আছেন। তাদের জন্যে পৃথক ব্যবস্থা করতে হবে।

এই ব্রাহ্মণদের মধ্যে একজন, নওলকিশোর, আপন স্বাতন্ত্র্যে সবচেয়ে বড় মর্যাদার আসন দখল করে বসলেন। গায়ে সাবান-কাচা মেরজাই, মাথায় হলদে পাগড়ি, কিংবা পায়ে মোষের চামড়ার মোটা নাগরা এমন কিছু স্বাতন্ত্র্য-ব্যঞ্জক নয়। কিন্তু তাঁর কপালের মোটা সিন্দুরের ফোঁটা, গলার রুদ্রাক্ষের মালা, হাতের লোহার বালা, বিশেষ করে কাঁচা-পাকা মন-মহেশ দাড়ি, এই জনতার মধ্যে একান্ত করে তাঁর দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে বাধ্য।

করলও তাই। আর-সকলে যখন উঠানে ঢালাও শতরঞ্চির উপর আসন গ্রহণ করলে, তখন নওলকিশোরের জন্যে উঁচু দাওয়ার উপর স্বতন্ত্র আসনের ব্যবস্থা হল। নওলকিশোর পণ্ডিত ব্যক্তি এবং একজন বড় জ্যোতিষী। পার্কের সামনে ফুটপাতে একটা মড়ার মাথা, গোটা দুই হাড় এবং একখানা কাগজের ছক বিছিয়ে বহু লোকের হাত তিনি দেখেন এবং রামখেলাওনদের মহলে তাঁর মুখের বাক্য ব্রহ্মবাক্যের মত অভ্রান্ত।

নওলকিশোর মদ খান না, 'কারণ' পান করেন। একটা পাত্রে মদ ঢেলে

সসম্ভ্রমে তাঁর সামনে এনে হাজির করা হল। অনেক রকম মুদ্রা এবং অনেক রকম মন্ত্র পড়ে সেই মদ শোধন করে তিনি কারণবারিতে পরিণত করলেন। তার কিয়দংশ উঠানে উপবিষ্ট ইতরজনের মদ্যভাণ্ডে মিশ্রিত করে তা পবিত্র করে দিলেন। তারপর উপর্যুপরি দু পাত্র কারণ পান করে পাগড়ির প্রান্তে গোঁফ-দাড়ি মুছে প্রসন্ন নেত্রে সম্মুখে গরুড়পক্ষীর মত করজোড়ে উপবিষ্ট রামখেলাওনের দিকে দৃষ্টিপাত করে এক পাত্র প্রসাদী কারণ তার দিকে বাড়িয়ে দিলেন

কারণ পানের পর উভয়ের চোখে যখন গোলাপী নেশা লেগেছে তখন নওলকিশোর বললেন, কেয়া বেটা, তুমকো ম্যয় বোলা নেহি?

কিছুমাত্র চিন্তা না করেই রামখেলাওন জবাব দিলে, জরুর বলেছিলেন পণ্ডিতজী।

—যে তোর বহুৎ রুপেয়া এসে যাবে।

পণ্ডিতজীর সঙ্গে দু-চার বৎসরের মধ্যে রামখেলাওনের দেখা হয় নি, কিছু বলা তো দূরের কথা। কিন্তু কিছুটা অর্থযোগ এবং কিছুটা মদ্যের কল্যাণে মন তার এমনই প্রসন্ন যে, দ্বিধামাত্র না করে জবাব দিলে, হাঁ পণ্ডিতজী।

—দেখি তোর হাত।

রামখেলাওন ডান হাত বাড়িয়ে দিলে।

ঝুলি থেকে চশমার খাপ এবং তা থেকে একটা নিকেলের চশমা বের করে পণ্ডিতজী অনেকক্ষণ তার হাত উলটে-পালটে এবং নিবিষ্ট চিত্তে করতলের রেখাগুলি পরীক্ষা করে জিজ্ঞাসা করলেন, তোর গাধা আছে?

ধোপার গাধা থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু পণ্ডিতজীর জ্যোতির্বিদ্যার প্রগাঢ়তায় অভিভূত হয়ে রামখেলাওন সবিস্ময়ে স্বীকার করলে, আছে।

পণ্ডিতজী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওর বিস্ময়াভিভূত মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে সশব্দে এমন একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লে যে, সকলে আশঙ্কায় এবং উদ্বেগে কাঠের মত শক্ত হয়ে রুদ্ধ নিশ্বাসে পরবর্তী আঘাতের জন্যে প্রতীক্ষা করতে লাগল।

পণ্ডিতজী ধীরে ধীরে প্রশ্ন করলে, উ কাঁহা হায়?

রামখেলাওনের মন তখন গাধার দিকে নয়, পণ্ডিতজীর তীক্ষ্ণ, কঠোর, রহস্যময় মুখের দিকে। অন্যমনস্কভাবে উত্তর দিলে, উধার হায় কাঁহা।

পণ্ডিতজীর শ্মশ্রুগুম্ফাবৃত অস্পষ্ট অথচ কঠিন ওষ্ঠাধর ধীরে ধীরে একটি প্রসন্ন রহস্যময় হাস্যরেখায় বিকশিত হয়ে উঠল। বললেন, ওর তাউৎ করিস বেটা, ও তোর ফুফী আছে।

—আঁঃ!—আকাশ থেকে বাজ পড়লেও মানুষ অমন চমকে ওঠে না।—ফু-ফী?

—হাঁ বেটা, গতজন্মে ও তোর ফুফী ছিল। ওর অনেক হীরা জহরত টাকা-কড়ি ছিল। লেকিন কোন ছেলেপুলে ছিল না। তোকে ও বড় পেয়ার করত। তাই অনেক ফন্দি-ফিকির করে ওর দেওর-ভাসুরের ছেলেদের ফাঁকি দিয়ে সবই তোকে দিয়ে গিয়েছিল। সেই পাপে এজন্মে ও গাধা হয়ে জন্মেছে আর তোরই কাছে এসেছে। এ জন্মেও তোকে বহুত রুপেয়া ও দিলে। ওর সেবা-যত্ন করিস।

কোন গ্রীক মন্দিরের ওরাক্‌ল্ এর চেয়ে গম্ভীর কণ্ঠে এর চেয়ে লোমহর্ষণ ভবিষ্যদ্বাণী কখনও করে নি।

সমস্ত জনতা যেন বজ্রাহত।

অকস্মাৎ সকলকে সচকিত করে রামখেলাওন ছিটকে ভিতরে চলে গেল। তার কানে যেন কার একটা অস্ফুট গোঙানির শব্দ এল।

তাই বটে। রুকমিনির অন্তিম দশা। বড় বড় অবোধ চোখ মেলে মুহূর্তের জন্যে রামখেলাওনের দিকে চেয়েই চিরকালের জন্যে তা বন্ধ হয়ে গেল।

তারপরে?

তারপরে এল নেয়ারের খাটিয়া, চমৎকার তোশক, ফুল-তোলা বালিশ। এল বেনারসী শাড়ি। রুকমিনিকে সেই নেয়ারের খাটে বালিশ-বিছানায় শুইয়ে বেনারসী শাড়ি ঢাকা দেওয়া হল। এবং সেই বিরাট জনতা সেই খাটিয়া কাঁধে করে গগনবিদারী 'রাম নাম সৎ হ্যায়' ধ্বনির মধ্যে রুকমিনিকে গঙ্গার কূলে নিয়ে গেল।

আর তার শ্রাদ্ধে যে সমারোহ হল তার সঙ্গে মাত্র জমিদার-গৃহিণীর শ্রাদ্ধেরই তুলনা চলে।

॥ জ্যাক ও জিপ ॥

অপূর্বর টেলিগ্রাম পেয়ে মীরা মিনিট খানেকের জন্যে কেমন যেন আচ্ছন্নের মত হয়ে গেল। চোখের কোণে এক বিন্দু জল চকচক করে উঠল। মনে পড়ল স্বর্গীয় বাবার কথা।

মা তাদের অনেক দিনই মারা গেছেন। বাবাকেই ওরা দুই ভাই-বোনে একসঙ্গে বাবা এবং মা বলে জানত। অপূর্ব আজ ফিরেছে আই. সি. এস. হয়ে। বাবা বেঁচে থাকলে আজ কী আনন্দই না করতেন!

তার পরেই মনে পড়ল তাদের দিল্লির বাড়ির কথা। সে বাড়ি জনৈক সহৃদয় প্রতিবেশীর তত্ত্বাবধানে তালাবন্ধ পড়ে আছে। অপূর্ব মেম সাহেব বিয়ে করেছে এ খবর মীরারা আগেই পেয়েছে। কিন্তু ওরা এসে উঠবে কোথায়? কে জানে বাড়ির কী শ্রী হয়েছে! সেই কথা ভেবে মীরা আরও চঞ্চল হয়ে উঠল।

তার একবার দিল্লি যাওয়া দরকার। তার স্বামীর অফিসটা যেমন হতভাগা, তাতে সে যে এ সময় ছুটি পাবে সে ভরসা কম। তবু তাহলে তাকে একলাই যেতে হবে। উপায় কী?

যাওয়া দরকার নানা কারণে। অনেক দিন পরে দাদাকে দেখবে, সে আগ্রহ তো আছেই। তা ছাড়া মারা যাওয়ার সময় বাবা যে সমস্ত দরকারী কাগজ-পত্র দিয়ে গেছেন, সেগুলো তাকে হাতে হাতে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার।

তারপরে জ্যাক।

জ্যাক ছিল অপূর্বর অত্যন্ত আদরের। বিলাতে যাবার সময় এটিকে সে বাপের জিম্মায় রেখে গিয়েছিল। না তাঁর কাছে, না মীরার কাছে, জ্যাকের অনাদর এবং অযত্ন কখনও হয় নি। এখন তাকে তার আসল মালিকের হাতে সমর্পণ করে দেওয়া উচিত।

সময় আর নেই। সন্ধ্যার সময় স্বামী অফিস থেকে ফিরতেই মীরা সমস্ত জানালে। এবং যখন দেখলে এ সময়ে স্বামীর ছুটি পাওয়া নিতান্তই অসম্ভব, তখন পরের দিন সে একাই দিল্লি রওনা হল। অপূর্ব পৌঁছবার অন্তত চার দিন

আগে তো যেতে হবে। নইলে ঘর-দোর গোছ-গাছ হবে কী করে? সঙ্গে গেল বিশ্বাসী এবং করিতকর্মা ভৃত্য বুধিয়া আর জ্যাক।

সঙ্গে নবপরিণীতা মেমসাহেব নিয়ে অপূর্ব নির্দিষ্ট দিনে এসে পৌছল। মীরা স্টেশন থেকে ওদের অভ্যর্থনা করে নিয়ে এল। এইটুকু পথ মোটরে আসতে আসতেই প্যামেলার সঙ্গে মীরার খুব ভাব হয়ে গেল, যেন কত কালের চেনা।

মীরার বেশী বকা অভ্যাস। প্যামেলাকে পেয়ে মনের আনন্দে অনর্গল বকতে লাগল :

—রাস্তায় তোমাদের কোন কষ্ট হয় নি তো? ঢেউয়ের দোলায় শরীর নাকি খুব খারাপ করে! সে রকম কিছু···কিছু না? খুব বাহাদুর তো! কিন্তু কী সুন্দর তোমার কুকুরটি বউদি! কী নাম এর? জিপ? ভারি সুন্দর কুকুর! তোমার কুকুরটার কথা মনে আছে দাদা? জ্যাক? প্রকাণ্ড কুকুর হয়েছে। বাবা মারা যাবার সময় (এইখানে মীরা একটু থামলে, গলা যেন ধরে গেল। একটু কেশে গলাটা ঠিক করে নিলে।) আমার হাতে ওকে দিয়ে গেলেন। অযত্ন যে করি নি দেখলেই বুঝতে পারবে। এনেছি সঙ্গে করে। উনি বললেন, এইবার মালিকের হাতে কুকুরটি দিয়ে এস। বাড়ি গেলেই দেখতে পাবে। কিন্তু তোমাকে চিনতে পারবে কি না কে জানে! দেখাই যাক চিনতে পারে কি না! কুকুরের প্রভুভক্তির পরিচয় পাওয়া যাবে। কী বল বউদি? হাঃ হাঃ হাঃ!

মীরার হাসির একটা অদ্ভুত সংক্রমণশক্তি আছে। ওর খুশি এই সুন্দর হাসির মাধ্যমে চারিপাশের সবাইকে খুশি করে তোলে।

ওর হাসিতে প্যামেলা এবং অপূর্ব দুজনেই হেসে উঠল।

হাসতে হাসতে প্যামেলা বললে, জ্যাকের চিনতে দেরি হবে না দেখো। দেরি হবে অপুরই।

—সত্যি দাদা? পারবে না চিনতে?

মুখ টিপে হাসতে হাসতে অপূর্ব বললে, কী জানি! দেখিই তো আগে।

প্যামেলা বললে, দেখাদেখি নেই এর মধ্যে। ভৃত্যেরা কচিৎ ভুল করে। ভুল হয় প্রভুরই। প্রভুরাও যদি ভৃত্যের মত বিশ্বস্ত হত, তা হলে পৃথিবীর বারো আনা অনর্থ ঘটতই না।

অপূর্ব এর প্রতিবাদ করলে না।

শুধু বললে, এইবার আমরা এসে গেছি প্যামেলা। নামো।

জ্যাকের চিনতে দেরি হল না সত্যই।

ফটকের মধ্যে ওরা ঢুকতেই জ্যাক এক লাফ দিয়ে এসে অপূর্বর দু পায়ের মধ্যে শোঁকাশুঁকি আরম্ভ করলে। তারপরে তার হাঁটুর উপর দুই থাবা দিয়ে দাঁড়িয়ে মুখখানা তুলে ধরলে। ভাবখানা, কতদিন পরে এলে, আমাকে একটু আদর করবে না?

অপূর্ব দুই হাত বাড়িয়ে আদর করতে যেতেই জ্যাকের দৃষ্টি পড়ল জিপের উপর।

সঙ্গে সঙ্গে ও যেন থমকে কী রকম হয়ে গেল। ওর চোখে ফুটে উঠল একটা জিজ্ঞাসা-চিহ্ন: ও কে? ও আবার কে?

প্যামেলার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ছিল জিপ; জ্যাকের দৃষ্টির বিনিময়ে সে শুধু একটা মৃদু গর্জন করলে, গর্‌-র্‌-র্‌।

প্যামেলা উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠল, বাঃ! চমৎকার কুকুরটি তো! কী নাম বললে? জ্যাক? জ্যাক! জ্যাক!

ওকে আদর করবার জন্যে প্যামেলা হাত বাড়ালে।

জ্যাক যে খুব খুশী হল তা মনে হল না। কিন্তু এটুকু সে বুঝলে যে এই মহিলা সামান্যা ব্যক্তি নন। ইনি কর্ত্রীস্থানীয়াই কেউ হবেন, এবং এঁকে উপেক্ষা করা সমীচীন হবে না।

সুতরাং যথারীতি লেজ নেড়ে এবং প্যামেলার হাতে মুখ ঘষে সে অল্পক্ষণের জন্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করেই অপূর্বর কাছে পুনরায় ফিরে এল।

না এসে উপায়ও ছিল না। কারণ প্যামেলার কাছে যেতেই জিপ আবার একটা মৃদু গর্জন করলে। ভাবটা, খবরদার, এদিকে আদর কাড়বার চেষ্টা করো না।

জ্যাক ভড়কে গেল। কুণ্ঠিতভাবে কুঁই-কুঁই করতে করতে অপূর্বর কাছে ফিরে এল। পরক্ষণেই সমস্ত অপমান ভুলে গিয়ে লেজ নাড়তে লাগল। যেন বলতে চাইল, বয়েই গেল! তোর মনিবের কাছে যাবার জন্যে আমার দায় পড়েছে! আমার অমন সুন্দর মনিব থাকতে তোর মনিবের কাছে যাবই বা কী জন্যে?

এবং মনিবের পিছু পিছু লাফাতে লাফাতে সিঁড়ি দিয়ে উপরে চলে গেল।

চমৎকার বলিষ্ঠ কুকুর!

ওর লাফিয়ে লাফিয়ে উপরে ওঠার ভঙ্গির দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে চাইতে চাইতে প্যামেলা বললে, চমৎকার কুকুর তোমার অপু! বুল-টেরিয়ার, না?

পিছন ফিরে জ্যাকের দিকে সহাস্যে চেয়ে অপূর্ব ঘাড় নেড়ে জানালে, হ্যাঁ।

তারপরে বললে, ও যে এতদিন পরে আমাকে চিনতে পারবে ভাবতেই পারি নি। কী আশ্চর্য ওদের স্মরণশক্তি!

গম্ভীরভাবে প্যামেলা বললে, বললাম তো তোমাকে, ওরা প্রভুকে সহজে ভোলে না। আমার এই জিপ, একবার···

—এটি কী কুকুর ভাই?—মীরা জিজ্ঞাসা করলে। বড় বড় লোমওয়ালা কুকুরটিকে তার ভারি অদ্ভুত লাগছিল। ওর চোখে-মুখে সব দেহে বড় বড় লোম ঢেউ খেলে যাচ্ছে। ওর চলাফেরায় কেমন একটা অভিজাত ঔদাসীন্য। চোখে যোগীসুলভ বিষয়-বিতৃষ্ণা।

—এটি কী কুকুর ভাই?—জিপকে কোলের উপর তুলে নিয়ে মীরা জিজ্ঞাসা করলে।

—পমিনেরিয়ান।—প্যামেলা সংক্ষেপে বললে।

অপূর্ব পোস্টেড হল রাজসাহীতে। দিল্লির বাড়িখানির সুবন্দোবস্ত করে দিন কয়েক পরে ওরা এল কলকাতায়। সেখানে দিন দুই মীরার বাড়িতে হই-চই করে চলে গেল রাজসাহী।

চারটি প্রাণী, অপূর্ব আর প্যামেলা, জ্যাক আর জিপ।

এ কদিন মীরা ছিল। সুতরাং জ্যাক কোন অসুবিধা বোধ করে নি। রাজসাহী গিয়ে কয়েক দিনের মধ্যে সে অসুবিধা অনুভব করতে লাগল।

খাওয়া-দাওয়া নয়, অন্য রকমের একটা অনির্বচনীয় অসুবিধা।

অপূর্ব তাকে আদর-যত্ন যথেষ্টই করে। কিন্তু দিনের অধিকাংশ সময়ই সে থাকে অফিসের কাজ নিয়ে ব্যস্ত। বিকেলে খেলাধুলা আছে, সন্ধ্যায় ক্লাব। এর উপর আছে স্বয়ং প্যামেলা। সুতরাং জ্যাক ওকে কতটুকু সময়ই বা পায়!

প্যামেলা—সেও লোক খারাপ নয়, দয়া-মায়া আছে। খাওয়া-শোওয়া নিয়েও জিপের সঙ্গে কোন তারতম্য করে না। কিন্তু তবু সে জিপেরই মনিব, জ্যাকের নয়। ওর উপর জ্যাকের তো সত্যিসত্যি কোন জোর নেই।

এই 'জোর'টাই হল আসল কথা।

এ বাড়ি যেমন জিপের মনিবের, তেমনি জ্যাকেরও। বরং জ্যাকের মনিবেরই বেশী। অপূর্বই হল আসল মনিব। সে-ই খাটে-খোটে, রোজগার করে আনে, তবে প্যামেলার নবাবী চলে। কিন্তু এ সবই হল আইনের কথা। আসলে জিপের মনিবের কর্তৃত্ব অনস্বীকার্য। এবং সেইটে উপলব্ধি করে এক-

দিকে যেমন জিপের গুমোর বেশী, অন্যদিকে তেমনি জ্যাকও কিছুতে জোর পায় না।

জ্যাক যে খুব জেদী দাম্ভিক, তাও নয়। মনে মনে সে জিপের প্রাধান্য স্বীকার করে। প্রকাশ্যেও মাঝে মাঝে জিপকে তোয়াজ করার চেষ্টা করে।

কিন্তু জিপ যেন কী রকম! জ্যাককে সে 'এক নেশন' বলে স্বীকারই করে না। জ্যাক যদি কখনও ওর কাছে ভাব করতে আসে, জিপ হয় তাকে চোখ পাকিয়ে গর্জন করে ধমক দেয়, নয়তো ফেঁচকে প্যামেলার কাছে পালিয়ে যায়।

জ্যাক বোকার মত চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর আস্তে আস্তে শোবার জায়গাটিতে গিয়ে দুই পায়ের মধ্যে মুখ ঢেকে ক্ষুণ্ণচিত্তে শুয়ে পড়ে।

তা ছাড়া কীই বা করতে পারে সে!

হাজার হোক, জিপ মেমসাহেবের কুকুর।

জ্যাকের মনে সুখ নেই।

অপূর্ব একদিন জিজ্ঞাসা করলে প্যামেলাকে, জ্যাকটা রোগা হয়ে যাচ্ছে যেন!

প্যামেলাও উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে জ্যাকের দিকে চাইলে।

বললে, কী জানি!

—খাচ্ছে?

—খাচ্ছে বইকি!

—তা হলে ভয়ের কিছু নেই।—অপূর্ব চা খেতে-খেতে বললে, ডিনার-টেবিলটা আজ সকালে পৌছচ্ছে খবর পেলাম। চাপরাসী পাঠিয়েছি, একটু পরেই এসে যাবে বোধ হয়।

প্যামেলা খুশী হয়ে বললে, তাই নাকি?

তারপরে কোথায় টেবিলটা বসানো যায় তাই নিয়ে ওরা ব্যস্ত হয়ে রইল, যতক্ষণ না হাঁক-ডাক করে সেটা এসে পৌছল। জ্যাকের সম্বন্ধে অপূর্বর মনে উদ্বেগের লেশমাত্রও রইল না।

বেচারা জ্যাক!

ওই যে বললাম, খাওয়া-শোওয়ার কোনও অযত্ন জ্যাকের নেই, কিন্তু এ বাড়িতে তার জোরটাই গেছে কমে। এ বাড়িতে সে যেন অতিথি মাত্র। খায়-দায়, ঘুরে বেড়ায়, বিরক্ত বোধ করলে শুয়ে থাকে।

মীরা এল ক'দিনের জন্যে বেড়াতে।

বললে, জ্যাকের শরীরটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে কেন দাদা?

—কী জানি ভাই। অথচ যত্নের কোন ত্রুটি হচ্ছে না।

জ্যাক মীরাকে দেখে খুশী হল। তার কাছে দাঁড়িয়ে লেজ নাড়তে লাগল। ভাবটা, আমার অবস্থাটা দেখ দিদিমণি—কী ছিলাম, কী হয়েছি।

ওর গায়ে সস্নেহে হাত বুলোতে বুলোতে বললে, শরীর নয়, ফুর্তিটা যেন কমে গেছে। এ জায়গাটা বোধ হয় ওর ভালো লাগছে না। ওকে আমি নিয়ে যাই, কী বল? যাবি জ্যাক, যাবি?

জ্যাক কী বুঝল জানি না, কিন্তু মীরার আদরে গলে গিয়ে ভউ ভউ করে শব্দ করে উঠল। তার পরিপূর্ণ কণ্ঠের এই ডাকটা স্ফূর্তির ডাক। এ বাড়িতে এই প্রথম সে এমনি শব্দ করে ডাকলে।

সে আওয়াজে অপূর্ব খুশী হল। পরম আদরে জ্যাককে নিজের দুই উরুর মধ্যে চেপে ধরে, তার মাথায় মৃদু মৃদু আঘাত করতে করতে বললে, নিয়ে যাবি কী রে? তা হলে আমি থাকব কী করে?

প্যামেলা একপাশে বসে সেলাই করছিল। বললে, তাই নিয়ে যাও বরং। আমি হয়তো ওর ঠিক যত্ন করতে পারছি না।

মীরা ক্ষুণ্নকণ্ঠে বললে, সে কথা তো আমি বলি নি বউদি।

অপূর্ব তাড়াতাড়ি বললে, সে কথা তো বলে নি প্যামেলা। তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করবার কী থাকতে পারে?

—অভিযোগটা তবে কার বিরুদ্ধে?

—কারও বিরুদ্ধে নয় বউদি, তোমার বিরুদ্ধে তো নয়ই। জ্যাকের শরীর খারাপ হয়েছে। হয়তো জায়গাটা ওর ভালো লাগছে না। তাই ওকে নিয়ে যেতে চাইছিলাম। এর মধ্যে দোষের কী আছে?

প্যামেলা বললে, বেশ তো, নিয়ে যাও না।

—যাবই তো।—মীরা জেদের সঙ্গে বললে, আমি ওকে মানুষ করেছি। আমি যদি ওকে নিয়ে যেতে চাই, কে বাধা দিতে পারে?

অপূর্ব হাসতে হাসতে বললে, কেউ বাধা দিতে যাচ্ছে না তো মীরা। ইচ্ছে করলে তুই নিয়ে যেতে পারিসই তো।

প্যামেলা আর-একটি কথাও বললে না। নিঃশব্দে সেলাই করতে লাগল।

কথাটার মধ্যে রাগারাগির কিছুই নেই। কুকুরের কেন, কুকুরের মালিকেরও শরীর নানা কারণে খারাপ হতে পারে, যত্ন সত্ত্বেও। তার জন্যে কারও কুণ্ঠিত, ক্ষুব্ধ অথবা ক্রুদ্ধ হবার কিছু নেই।

অথচ প্যামেলা ক্রুদ্ধ হল কেন?

কে জানে কেন! কিন্তু এই ক্রোধ মীরার ভালো লাগল না। তার মনে সন্দেহ দেখা দিল। স্থির করলে, জ্যাককে সঙ্গে করে নিয়ে যেতেই হবে। তার মনে হল, ওকে এখানে রেখে যাওয়া ঠিক হবে না।

অথচ নিয়ে যেতেও পারলে না।

যে ক'দিন মীরা এখানে রইল জ্যাক সর্বক্ষণ ওর পায়ে-পায়ে ঘুরল, ওর গা ঘেঁষে বসল আর কত রকমে যে ওর আদর কাড়ল তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু যেই বুঝল, মীরা ওকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবে, অমনি কেমন আড়ো-আড়ো ভাব দেখা দিল।

শেষ মুহূর্তে যখন গলায় চেন বেঁধে মীরা ওকে নিয়ে যাবার জন্যে টানতে লাগল, তখন ও একেবারেই বেঁকে দাঁড়াল—কিছুতেই যাবে না।

প্যামেলার মুখের মেঘ কেটে গিয়ে যেন এক ঝলক হাসির রোদ খেলে গেল। অপূর্ব হেসে ফেললে। রাগ করতে গিয়ে মীরাও হেসে ফেললে। জ্যাকের কান মলে দিয়ে বললে, নিমকহারাম কোথাকার!

অপূর্বকে ছেড়ে যেতে জ্যাক চায় না। আবার মীরাও এইখানে থাক্, এই তার ইচ্ছা। তা হলে এ বাড়িতে তার স্বাভাবিক জোর সে পায়। কিন্তু তাকে জোর পাওয়াবার জন্য মীরা যে চিরকাল এখানে থেকে যেতে পারে না, সেটা সে বোঝে না।

সুতরাং মীরা চলে যেতে সে আবার মুষড়ে পড়ল। সমস্ত দিন তার বিছানায় নিঃঝুম হয়ে শুয়ে রইল।

অপূর্ব বললে, দেখছ, মীরা চলে যেতে জ্যাক কী রকম দমে গেছে!

প্যামেলা উত্তর দিলে, কিন্তু এতই যদি টান তবে ও গেলই না বা কেন তার সঙ্গে?

—কে জানে?

প্যামেলা তিক্ত কণ্ঠে বললে, আমি বলছি, তোমার এই জ্যাক সহজ কুকুর নয়। ও মাঝে মাঝে এমন করে আমার দিকে চায় যে ভয় করে।

অপূর্ব হা-হা করে হেসে বললে, না, না। জ্যাক বড় ভালো কুকুর।

—ভালো কুকুর! আমি কুকুর চিনি নে? ওর পেটে পেটে বহু দুর্বুদ্ধি খেলছে, একদিন টের পাবে।

অপূর্ব হাসতে হাসতে জ্যাকের মাথায় হাত বুলোতে লাগল। ওদের

কথা জ্যাক বুঝতে পারলে কি না কে জানে, কিন্তু অপূর্বর অত আদরেও ও কী রকম অস্বস্তিতে ছটফট করতে লাগল।

সে রাত্রিও জ্যাকের খুব মন-খারাপের মধ্যেই কাটল। পরদিন সকালে শান্ত হয়ে এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি করতে লাগল। বিকেলে মনকে বুঝিয়ে ফেললে :

সত্যই তো, জিপ হল মেমসাহেবের কুকুর। জ্যাকের স্থান তার নীচে হতে বাধ্য। অপূর্বকে ছেড়ে যখন সে যেতে পারবে না এবং এই বাড়িতে থাকতেই তাকে হবে, তখন-জিপের শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নেওয়াই তার পক্ষে শ্রেয়। নইলে অনেক অনর্থের সৃষ্টি হতে পারে এবং দেহে মনে কষ্ট পেতে হবে তাকেই।

বিকেলে জিপ বাগানে একটা হলদে প্রজাপতির পিছনে ছুটোছুটি করছিল। জ্যাক স্থির করলে এই অবসরে জিপকে একটু তোয়াজ করে আসা যাক।

বাগানের দিকের ঘেরা বারান্দায় প্যামেলা বসে বসে একখানা নভেল পড়ছিল।

জ্যাক অত্যন্ত বিনীত ভাবে জিপের দিকে অগ্রসর হল। তার ইচ্ছা করছিল, এই চমৎকার বিকেলে জিপের সঙ্গে ও-ও প্রজাপতির পিছনে ছুটোছুটি করার খেলায় যোগ দেয়। এই ভেবে যেই ও জিপের কাছে যাবে, জিপ সেই সময়েই অন্যমনস্কভাবে ছুটে এসে জ্যাকের গায়ে পড়ল।

মীরা যে ক'দিন এখানে ছিল, জ্যাকের যেন পাঁচটা পা গজিয়েছিল। দেমাকে যেন সে ধরাকে সরা জ্ঞান করছিল। এখন মীরা নেই, জ্যাক অসহায়। জ্যাকের গায়ে গিয়ে পড়বামাত্র জিপের রাগ যেন বোমার মত ছিটকে পড়ল।

চোখের পলকে সে জ্যাকের মুণ্ডুটাকে তীক্ষ্ণ দাঁতে কামড়ে ধরে ছিটকে ফেলে দিলে। এবং তৎক্ষণাৎ এক ছুটে গিয়ে প্যামেলার দুই পায়ের ফাঁকে বসে গোঁ গোঁ করতে গাগল।

আক্রমণের আকস্মিকতায় হতবুদ্ধি হয়ে জ্যাক প্রথমেই চিৎকার করে উঠল, কিন্তু তখনই চুপ ক'রে গেল। ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে উঠে তার বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল।

প্যামেলা বইতে তন্ময় হয়ে ছিল। জ্যাকের আর্তনাদ সে শুনতে পেলে না। জিপ যে ভালোমানুষের মত তার পায়ের কাছে গিয়ে বসেছে তাও টের পেলে না। সে যেমন নিবিষ্টচিত্তে বই পড়ছিল তেমনি পড়তে লাগল।

এমন সময় অপূর্ব ফিরলো আফিস থেকে।

প্যামেলা বইটা মুড়ে তার দিকে চেয়ে হাসলে। চাকর এসে অপূর্বর জুতো খুলতে লাগল।

সাড়া পেয়ে জ্যাকও ধীরে ধীরে এসে দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াল। তার সমস্ত মুখ রক্তাক্ত। তখনও রক্ত ভালো করে বন্ধ হয় নি।

তার দিকে চেয়ে অপূর্ব চমকে লাফিয়ে উঠল।

—ও কী হয়েছে জ্যাকের?

চাকরটা ব্যাপারটা দেখেছিল। বললে, জিপ কামড়ে দিয়েছে।

অপূর্ব এবং প্যামেলা দুজনেই সমস্বরে বললে, জিপ! কী ভয়ানক!

জিপ ভালোমানুষের মত যেখানে বসেছিলো, সেইখানেই বসে রইল। তার মুখ দেখে কে বলবে, কয়েক মিনিট আগে সে-ই এত বড় কাণ্ড করেছে!

শান্ত গম্ভীরভাবে জ্যাক অপূর্বর কাছে এসে দাঁড়াল। থমথম করছে তার মুখ এবং চোখ। আহা রে!

অপূর্ব এবং প্যামেলা দুজনেই তাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। তখনই এল গরম জল, ফরসা ন্যাকড়া। অপূর্ব পোশাক ছাড়বারও ফুরসত পেলে না। তখনই ওরা দুজনে মিলে জ্যাকের ক্ষত ধুয়ে দিতে লাগল।

জ্যাকের বাইরের ক্ষত শুকোতে দেরি হল না। কিন্তু মনের ক্ষত সহজে শুকোতে চাইল না। অপূর্ব কিংবা প্যামেলা কেউ যে এর মধ্যে জিপকে কঠিন রকম তিরস্কার করলে না, এটা জ্যাকের বুকে লাগল।

তার ফল হল এই যে, যতবার সে জিপকে দেখে ততবারই তার মাথায় আগুন জ্বলে ওঠে। সে কিছুতে নিজেকে সামলাতে পারে না। নিজের অজ্ঞাতসারেই তার কণ্ঠ থেকে একটা অস্ফুট গরগর শব্দ ওঠে।

প্যামেলা কিংবা অপূর্ব কেউ এটা লক্ষ করতে পারে না। কিন্তু জিপ পারে। সে সর্বসময় প্যামেলার কাছে কাছে থাকে। পারতপক্ষে তার সঙ্গ ছাড়ে না।

প্যামেলা এবং অপূর্ব দুদিন পরেই ব্যাপারটা ভুলে গেল। সামান্য দুটো কুকুরের ব্যাপার মনে রাখবার মতও নয়। কিন্তু জ্যাক ভোলে নি এবং তার চোখের দিকে চেয়ে জিপ ভুলতে চাইলেও ভুলতে পারে না।

দেখতে দেখতে জ্যাকের কি রকম যেন হল। সে খেতে পারে না, শুতে পারে না, কেবল ছটপট করে বেড়ায়। অপূর্বর সাড়া পেলে আগের মত কাছে এসে দাঁড়ায়, লেজ নাড়ে, আদর করলে আনন্দে চোখ বন্ধ করে। কিন্তু সমস্ত

সময় তার বুকের ভিতর কি যেন একটা কাঁটার মত খচখচ করে বিঁধতে থাকে। কিছুতেই সে স্বস্তি পায় না। জিপকে দেখলেই তার চোখে যেন একটা ফিচেল শয়তানী বিদ্যুতের মত ঝিলিক মেরে যায়।

আরও দিন কয়েক এমনি গেল।

তারপর হঠাৎ একটা কাণ্ড ঘটল :

প্যামেলা অন্য দিনের মতই বাগানের দিকে ঘেরা বারান্দায় বসে বসে বই পড়াছিল। জিপ তার পায়ের কাছেই অন্য দিনের মত নিঃশব্দে বসে ছিল।

তখন বিকেল তিনটে।

সামনের বাতাবি লেবুগাছ থেকে দুটো শালিক কিচির মিচির ঝগড়া করতে করতে ঝুপ করে এসে বাগানে পড়ল। স্বভাববশে জিপ ছুটে সেইখানে গিয়ে পড়লো।

শালিক দুটো উড়ে গেল। কিন্তু কোথায় ছিল জ্যাক, এই সুযোগ সে ছাড়ল না। বাঘের মত লাফ দিয়ে এসে পড়ল জিপের উপর।

তারপরে—

সে কী ধস্তাধস্তি !

ভৈরবী

কোথায় যাবে সেটা স্থির করতেই হয়তো ওদের এক মাস লেগে যেত—কিংবা হয়তো ছুটি ফুরিয়ে যাবার আগে স্থিরই হত না—এমন কাণ্ড। পুজোর বারোদিন ছুটির সঙ্গে আর আট দিন, এই তো কুড়ি দিন মোটে ছুটি। দেবী-দাসের ইচ্ছা দার্জিলিং যায়। প্রণতির তাতে ঘোরতর আপত্তি :

—দার্জিলিং-এ এখন বেশ শীত পড়েছে বাপু। শীত আমি সইতে পারি না। তার চেয়ে এমন কোথাও চল যেখানে বেড়ানও হবে, তীর্থ করাও হবে।

—তার মানে পাণ্ডাদের হাতে গিয়ে পড়তে হবে। রক্ষে কর!

সাতদিন ধরে অফিস যাওয়ার আগে পর্যন্ত এবং রাত্রে ঘুম না আসা পর্যন্ত এই 'রক্ষে-করাকরি'র পালা চলল। হয়তো আরও চলত। রক্ষা করলে ব্রজভূষণ।

জিজ্ঞাসা করলে, কি হে চাটুজ্জ্যে, পুজোয় কোন্ দিকে বেরুচ্ছ?

মাথা চুলকে দেবী বললে, সেইটেই স্থির করতে পারছি না।

—কেন?

—মতে মিলছে না। আমার ইচ্ছে দার্জিলিং কি শিলং।

—আর বউ-এর ইচ্ছে?

—তাঁর তীর্থে মতি হয়েছে এই বয়সে! বলছেন, যেদিকে বেড়ানও হবে তীর্থও হবে, তেমন কোনও দিকে যেতে

ব্রজভূষণ হেসে জিজ্ঞাসা করলে, তোমাদের কি কর্তার ইচ্ছায় কর্ম, না কর্ত্রীর ইচ্ছায়?

—কর্ম কোনদিন কর্তার ইচ্ছেয় হয় না রে দাদা! বিয়ে-থা তো করলে না।

—তাহ'লে এক কাজ কর না কেন?

—কি কাজ বল?

—তোমাদের তো যে-রকম ব্যাপার বলছ, তাতে যাওয়া ঠিক হতে-হতে ছুটি ফুরিয়ে যাবে।

দেবী স্বীকার করলে,' ব্যাপার সেই রকমই।

—তাহলে আমাকে কেন তোমাদের সঙ্গে নাও না।

—কি করে ?

—আমি যাচ্ছি নাগপুরের দিকে। সেই দিকে চল না। তোমরা সঙ্গে থাকলে, আমার অনেক সুবিধা হবে।

—মন্দ বল নি। কিন্তু সেদিকে কোন তীর্থ আছে ?

—আছে বই কি। ভারতবর্ষে অন্ন-বস্ত্রের যত অভাবই থাক, তীর্থের অভাব নেই। যেদিকে যাবে, সেই দিকেই অগুন্‌তি তীর্থ।

দেবী ভেবে বললে, আমি তো রাজি। কিন্তু বাড়িতে একবার জিগ্যেস না করে তো পাকা কথা দিতে পারছি না।

—বেশ তো, তাই দিও।

তীর্থ আছে শুনে প্রণতি সঙ্গে সঙ্গে সম্মতি দিলে। ব্যবস্থা হয়ে গেল। সপ্তমীর দিন ওরা তিন জনে একটা প্যাসেঞ্জার ট্রেনে রওনা হল।

দেবী একবার আপত্তি করেছিল প্যাসেঞ্জার ট্রেনের নামে। সব স্টেশনে থামতে থামতে ধিকি-ধিকি যাবে।

—গেলেই বা! আমাদের তো নির্দিষ্ট দিনে কোথাও পৌছুবার তাড়া নেই। চলুক না ধিকি-ধিকি। তাছাড়া।...

—তাছাড়া ?

প্রণতির দিকে চেয়ে ব্রজ বললে, তুমি বিয়েটাই করেছ, কিন্তু এখনও গেরস্ত হতে পার নি।

—কেন ?

—প্রথমত, প্যাসেঞ্জারে ভাড়া কম। তাছাড়া তাড়াতাড়ি গিয়ে এক জায়গায় যে উঠবে, সেখানকার ঘরভাড়া ইত্যাদি আছে। রেলগাড়িতে বাড়তি ঘরভাড়াটা লাগবে না। বেড়াতে বেরিয়েছি, দিব্যি আরামসে রয়ে-বসে ঘুরি না। তাড়া তো কিছু নেই।

প্রণতি ঠেস দিয়ে স্বামীকে বললে, দেখ গেরস্ত না হয়েও কি রকম হিসেবী!

ঘুরতে ঘুরতে গিয়ে পৌছুল রামটেক। বনবাসের পথে সীতাকে নিয়ে রাম আর লক্ষণ এখানে এক রাত্রি কাটিয়েছিলেন। পাহাড়ের উপর চমৎকার রাম-সীতার মন্দির। সেইখানে পাহাড় কেটে সুন্দর ইঁদারা। সারি সারি সিঁড়ি উঠে গেছে মন্দির পর্যন্ত। এক রাত্রি বাসের জন্যে এত কাণ্ড তাঁরা কেন করেছিলেন জানি না। কিন্তু পাণ্ডার কথায় বিশ্বাস করতে হলে, করেছিলেন।

দেবী বললে, দেখছ না একটা মারাঠা-কেল্লা। মধ্যখানে প্রকাণ্ড হ্রদ। তার চারদিক ঘিরে রয়েছে পাহাড়ের শ্রেণী। তাঁদেরই তৈরি রাম-সীতার মন্দির।

প্রণতি বিরক্তভাবে বললে, তোমরা কিছুই বিশ্বাস করতে চাও না কেন? সব তুচ্ছ করে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দাও কেন? অযোধ্যা থেকে দণ্ডকারণ্য যাবার এই তো পথ। এমন চমৎকার জায়গায় বিশ্রাম করে যেতেও তো পারেন।

—সেটা তো অবিশ্বাস করছি না। কিন্তু ওই মন্দিরটা?

বাধা দিয়ে ব্রজ বললে, অবিশ্বাস করবে কি করে? রাম-সীতা আজ নেই। কিন্তু সিঁড়ির দুধারে চেয়ে দেখ, অগুন্তি বানর। রাম-সীতা যদি না আসবেন তো তাঁর অনুচরেরা এলেন কি করে?

ভাববার কথা সন্দেহ নেই। তাঁরা শুধু এসেছেন নয়, মৌরসী পাট্টার বলে কলাটা-ছোলাটা ভেটও আদায় করছেন। ভেট না দিয়ে মন্দিরে যায় সাধ্য কার? পাণ্ডাদের উপদেশে যাত্রীরা নীচে থেকে ভেট সঙ্গে নিয়েই চলেছে।

ওরাও ভেট দিলে। মন্দির দেখলে ঘুরে ঘুরে। দক্ষিণ ভারতে আশ্চর্য কারুকার্য্য নেই। জবরদস্ত পাথরের তৈরী সাদা-মাটা মন্দির। প্রশস্ত উঠানের চারিদিকে অনেক ছোট ঘর, দেবীর মতে সৈন্যদের থাকবার ঘর।

কিন্তু রাম-সীতার মন্দিরই হোক, আর মারাঠা-কেল্লাই হোক, পাহাড়ের উপর থেকে নীচের দিকে চেয়ে সবাই মুগ্ধ হয়ে গেল

ওরা ভোরে স্নান করেই বেরিয়েছিল। পুজো দিয়ে, প্রসাদ নিয়ে একটা জায়গায় বসল।

হঠাৎ ব্রজ বললে, একটা কাজ করলে হয় না?

কাজ! কলকাতা থেকে বেরিয়ে পর্যন্ত কাজেরই অভাব। কাজের নামে দেবী এবং প্রণতিও উৎসাহিত হয়ে উঠল।

—কি কাজ?

—পাহাড়ের ওপরে-ওপরে চারিদিক একবার ঘুরে এলে কেমন হয়? মনে হচ্ছে, রাস্তা আছে। কিন্তু আপনার বোধ হয় একটু কষ্ট হবে।

—কিছু কষ্ট হবে না। চলুন তো।

প্রণতি তৎক্ষণাৎ শাড়ির আঁচল কোমরে আঁট করে জড়িয়ে তৈরি হয়ে দাঁড়াল।

রাস্তা রয়েছে। পাহাড়ের গায়ে শাল-পিয়াল-সেগুন গাছের রীতিমত জঙ্গল। তার ফাঁকে পায়ে-চলা পথ। কোথাও বেশ স্পষ্ট, কোথাও অস্পষ্ট, কোথাও বা একটু খুঁজে নিতে হয়। কোথাও উঁচু দিকে উঠেছে, কোথাও নীচে

নেমেছে। চড়াই-উতরাই-এ প্রণতির হয়তো একটু কষ্ট হচ্ছিল। কখনও কখনও হাত ধরে তুলতে হচ্ছিল। কিন্তু বাংলাদেশের মেয়ে। পাহাড়ে চড়ার অভিযানে যে উত্তেজনা আছে, তাই তাকে এ-পাহাড় থেকে ও-পাহাড়ে টেনে নিয়ে চলছিল। মুখ আরক্ত। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে। তবু চলেছে ওদের পিছু পিছু, প্রায় সমান তালে।

ব্রজ লক্ষ্য করলে।

বললে, এইখানে একটু জিরিয়ে নেওয়া যাক না বউদি। অনেকখানি আসা গেছে।

আর বলতে হল না। পাহাড়ের মাথায় সমতল জায়গাটার উপর তিনখানা পাথরে ওরা সকলেই বসল।

নীচে টলটল করছে হ্রদের নীল জল। তার চারিদিকের সুরকির রাস্তাটা যেন একগাছি লাল শাঁখার মত হ্রদটিকে বেষ্টন করে রয়েছে। সেই রাস্তায় যারা চলেছে কত ছোট দেখাচ্ছে তাদের! পিঁপড়ের মত কেমন গুটগুট করে চলেছে! দূরের গ্রামের ছোট ছোট খোলার ঘরগুলোকে মনে হচ্ছে তাদেরই ঘর। ছোট ছোট গুল্মের ঝোপের মত দেখাচ্ছে শালের গুচ্ছকে। ওদিকে রাস্তার উপর দিয়ে একখানা মোটরগাড়ি চলে গেল। যেন খেলাপাতির গাড়ি।

ব্রজ বললে, ওপর থেকে নীচের দিকে চেয়ে আমরা যেমন আশ্চর্য হচ্ছি, নীচের থেকে আমাদের দিকে চাইলে ওরাও তেমনি হত। কি ভাবত জানেন?

—কী?

—ভাবত, রাম-লক্ষ্মণ-সীতা কি আবার এসেছেন?

দেবী হেসে বললে, ভাগ্যিস মানুষের দৃষ্টি উর্ধ্বমুখী নয়! তা হলে আমরা বিপদে পড়ে যেতাম।

একটি নয়-দশ বৎসরের মেয়ে কাঁখে কলসী নিয়ে ওদিকে পাহাড়ে উঠছে। প্রণতির সেদিকে দৃষ্টি পড়তেই সে চিৎকার করে উঠল:

—দেখুন, দেখুন, একটি ছোট মেয়ে ওদিকের পাহাড়ে উঠছে। কী সুন্দর দেখাচ্ছে! ছবির মত।

তাই বটে। পরনে গৈরিক শাড়ি। ছোট ছোট গাছের ফাঁক দিয়ে চলেছে।

ব্রজ বললে, ওদিকে নিশ্চয় কেউ বাস করে।

—কি করে বুঝলেন?—প্রণতি কৌতূহলের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলে।

ব্রজ জবাব দিলে, ওইটুকু মেয়ে নিশ্চয় তীর্থে আসে নি। জল নিয়ে যাচ্ছে বাড়ির জন্যে। ওই পাহাড়ের ওপরেই থাকে কোথাও।

—এই পাহাড়ে কে মরতে থাকতে যাবে! তুমিও যেমন!—দেবীদাস তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললে।

—পরনে গেরুয়া শাড়ি! হয়তো কোন সন্ন্যাসীর আশ্রম আছে ওখানে। —ব্রজ বললে।

দেবী হেসে উঠল: পাগল আর কি! সন্ন্যাসীরা কি ছেলেমেয়ে নিয়ে বাস করে?

তাও বটে। সন্ন্যাসীদের ছেলেমেয়ে থাকবে কেন?

ব্রজ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে মেয়েটির যাওয়া লক্ষ্য করছিল। কিছুদূর ওঠার পরে আর তাকে দেখা গেল না।

বললে, সন্ন্যাসীই হোক আর গৃহীই হোক, মেয়েটি ওইখানে কোথাও থাকে। নিশ্চয় তার বাপ-মায়ের সঙ্গে।

প্রণতি বললে, চলুন না ব্রজবাবু, ওদিক দিয়ে একটু দেখেই যাই। কাছেই তো। তেষ্টা পেয়েছে ভয়ানক। হয়তো একটু জলও পাওয়া যেতে পারে ওখানে।

—তাই চলুন।

ওরা সকলেই জায়গাটা লক্ষ্য করে চলতে লাগল। এইখান থেকেই নেমে ওরা ধর্মশালায় ফিরতে পারত। অন্তত প্রণতির সেই রকমই ইচ্ছা ছিল। সে আর চড়াই-উতরাই পারছিল না। কিন্তু কৌতূহল বড় কঠিন জিনিস।

ব্রজর অনুমান মিথ্যা নয়। পাহাড়ের নীচের দিকে মাঝামাঝি জায়গায় একটি প্রশস্ত সমতল ক্ষেত্রে চমৎকার একটি আশ্রম। চারিদিকে ছোট ছোট গাছ এবং লতার বেড়া দিয়ে ঘেরা।

আগড় ঠেলে ভিত'র ঢুকে সামনেই সেই গেরুয়া শাড়ি-পরা মেয়েটি। বয়স বছর দশেকের বেশী হবে না। মেয়েটি যেরকম অবাক হয়ে ওদের দিকে চেয়ে রইল, মনে হল, এদিকে এর আগে হয়তো কোন মানুষ আসে নি। হয়তো এই গোপন আশ্রমটির সংবাদই কেউ পায় নি।

আর একটু ভিতরে যেতেই দেখলে, একটি শিশুশালের ছায়ায় একটি পুরুষ আর একটি নারী বসে রয়েছে। দুজনের পরিধানেই গৈরিক বস্ত্র।

মেয়েটির প্রসারিত হাতে একটি ছোট কলকে। পাছে একটি কণিকা ধোঁয়াও বেরিয়ে যায়, এজন্যে ঠোঁট এবং চোখ বন্ধ। চোখ বন্ধ পুরুষটিরও। হাঁটু দুটি দুই হাতে বেঁধে পিছনের একটি শিলাখণ্ডে ঠেস দিয়ে বোধ হয় মৌজ করছেন।

মেয়েটির বয়স ত্রিশের এদিকে। ফরসা রং। বেশ আঁটসাঁট গড়ন। মণিবন্ধে, বাজুতে এবং গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। অনবগুণ্ঠিত। মাথার রুক্ষ চুল পিছনে গিঁঠ দিয়ে বাঁধা।

পুরুষটির বয়স কিন্তু পঞ্চাশের কাছে। চোখ বন্ধ বলে টের পান নি, মেয়েটি তাঁর দিকে কলকে বাড়িয়ে দিয়েছেন।

কলকেটি তাঁকে অনেকক্ষণ পর্যন্ত নিতে না দেখে মেয়েটি চোখ বন্ধ করেই আহ্বান জানালে, নিন।

এবারে সন্ন্যাসী চোখ মেললেন। কিন্তু কলকেটি নেবার জন্যে হাত বাড়িয়েই এদের দিকে দৃষ্টি পড়ায় থমকে গেলেন।

—কৌন্ হ্যায়? কেয়া মাংতা হ্যায়?

সন্ন্যাসীর কণ্ঠস্বর রূঢ়।

প্রণতির ইঙ্গিতে পকেট থেকে দুটি টাকা বের করে সন্ন্যাসীর পায়ের তলায় রেখে দেবী প্রণাম করলে। তার পাশাপাশি প্রণতিও।

সন্ন্যাসী রূঢ় দৃষ্টিতে অবাঞ্ছিত অভ্যাগতদের দিকে নিঃশব্দে চেয়ে রইলেন। তাঁর কণ্ঠ থেকে আশীর্বাদের একটা টুকরোও বের হল না।

বাক্য এবং দৃষ্টি থেকে ওরাও বুঝলে, আশ্রমে ওদের অনধিকারপ্রবেশ সন্ন্যাসী মহারাজ ঠিক পছন্দ করেন নি।

প্রণতির তৃষ্ণা উবে গেছে। সে সভয়ে ব্রজর দিকে চাইলে। দেখে, ব্রজ একদৃষ্টে ভৈরবীর দিকে চেয়ে। ভৈরবীও ব্রজর দিকে। কারও চোখে পলক পড়ছে না। দুজনেরই দৃষ্টি যেন কোন দূরকালে নিবদ্ধ।

—অঞ্জলি, তুমি এখানে?

অনেকক্ষণ পরে ধীরে ধীরে ব্রজর কণ্ঠ থেকে শব্দকয়টি স্খলিত হল।

ভৈরবী মুহূর্তে চমকে উঠল। কি হয়তো চমকে উঠল না। ওদেরই দেখবার ভুল। কারণ তার দৃষ্টি তীরের মত বেগে তৎক্ষণাৎ সোজা সন্ন্যাসীর উপর নিবদ্ধ হল:

—উন্ লোক কেয়া মাংতা?

ভৈরবীর কণ্ঠে প্রচুর বিস্ময়। যেন ব্রজর ভাষা তার বোধগম্যই হয় নি।

—কেয়া জানে!—উপেক্ষা ভরে বলেই সন্ন্যাসী গর্জন করে উঠলেন—কেঁও দিক করতা? চলা যাও হিঁয়াসে।

সে গর্জনে দেবী এবং প্রণতি উভয়েই ঠকঠক করে কেঁপে উঠল। কিন্তু ব্রজ নির্বিকার। তার দৃষ্টি তখন একবার ভৈরবীর আর একবার তার ছোট কলকেটির মধ্যে দ্রুত সঞ্চরণ করছে। দেখতে দেখতে তার ঠোঁটের কোণে শীর্ণ একটি হাসির রেখা ফুটে উঠল।

সন্ন্যাসীর দিকে চেয়ে বললে, মাফ কিজিয়ে মহারাজ! হাম সমঝা···

কিন্তু তার কথা ডুবিয়ে সন্ন্যাসীর গর্জন উঠল: নেহি। তুম কুছ নেহি সমঝা। চলা যাও, চলা যাও!

আর কথা না বাড়িয়ে ওরা তিন জনে চলে এল।

ছোট বালিকাটির জন্যে যতখানি, তার চেয়ে ঢের বেশী একটু তৃষ্ণার জলের আশাতেই প্রণতির আসা। কিন্তু রুদ্র সন্ন্যাসীর কঠোর গর্জনে তৃষ্ণা মাথায় উঠেছে। সে-ই চলেছে সকলের আগে আগে। তৃষ্ণার কথা মনেই নেই। কি হয়তো মনে আছে। ভাবছে হ্রদের জলের কথা।

তার পিছনে দেবীদাস। তার কি রকম সমস্ত ব্যাপারটাই গোলমেলে বোধ হচ্ছে। সবশেষে ব্রজভূষণ কি যেন ভাবতে ভাবতে চলেছে। তিনজনেই নীরব।

ধর্মশালায় বিকেলে চা খেতে খেতে প্রণতি হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে বসল: এতক্ষণে আপনার সামলে যাওয়া উচিত ছিল ব্রজবাবু। পারছেন না কেন, ভেবে অবাক হচ্ছি।

মুখ থেকে পেয়ালাটা নামিয়ে দেবীদাস তাড়াতাড়ি বললে, ঠিক এই কথাই আমি বলতে যাচ্ছিলাম। সমস্ত দুপুরটা নিঃশব্দে চিন্তিত মুখে কাটালে। এখনও সেই অবস্থা। অত কেন ভাবছ?

ব্রজ সমস্ত দুপুর এড়িয়ে এড়িয়ে চলেছে। ভাবনাটা গোপন করবার জন্যেই। অবাক হয়ে গেল, এত চেষ্টাতেও গোপন করতে পারে নি। ওরা সমানে ওকে লক্ষ্য করে চলেছে।

মুখে হাসি টেনে প্রণতিকে জিজ্ঞাসা করলে, কী ভাবছি বলুন তো?

প্রণতি পট করে জবাব দিলে, অঞ্জলির কথা।

—নামটাও মনে আছে?

—আছে বই কি! সন্ন্যাসী মহারাজের ধমকের চোটেও একটা অক্ষর গুলিয়ে যায় নি। দেখছেন তো!

দেবী বললে, আচ্ছা ব্যাপারটা কি বল তো? তোমার ও-রকম ভুল হল কেন? মুখের সাদৃশ্য কি খুবই বেশি?

ব্রজ নিরুত্তরে প্রণতির দিকে চেয়ে হাসতে লাগল।

তারপর বললে, কি জানি, কি রকম গোলমাল হয়ে গেছল।

প্রণতি ধমকের ভঙ্গীতে বললে, না। কিছু গোলমাল হয়ে যায় নি। আপনি ঠিকই চিনেছেন এবং নিজেও সেকথা নিশ্চিতভাবে জানেন।

ব্রজ হাসলে। সায় দিয়ে বললে, তাই। আপনি ঠিকই ধরেছেন। আমি সুনিশ্চিত জানি, আমি ভুল করি নি!

—কিন্তু—দ্বিধাগ্রস্তভাবে দেবীদাস বললে—ও তো তোমার বাংলা কথা বুঝতেই পারলে না। ও যে বাংলা জানে তাই তো মনে হল না।

ব্রজ জিজ্ঞাসা করলে, কিন্তু ওর কিংবা ওর ছোট মেয়েটির মুখ দেখে কি মনে হয়? বাঙালী নয়?

দেবী স্বীকার করলে, মুখখানা বাঙালীর মতই মনে হল। বিশেষ ওই ছোট্ট মেয়েটির।

ব্রজ বললে, হাঁ। ও অঞ্জলি। কিন্তু ধরা দিলে না।

আপন মনে কি ভেবে ব্রজ একবার মাথা নাড়লে।

দেবী হঠাৎ বললে, আচ্ছা অনেকদিন আগে, তখন আমরা অল্প দিন হল কাজে ঢুকেছি, একটি মেয়ের সঙ্গে তোমার ভাব হয়েছিল,—তারও যেন অঞ্জলি নাম ছিল না?

—হ্যাঁ। সেই মেয়েই ওই ভৈরবী।

—কি যেন একটি সাব-জজের মেয়ে?—দেবী জিজ্ঞাসা করলে।

—হ্যাঁ।

—তার সঙ্গে তোমার বিয়ের কথা হয়েছিল না?—দেবী আবার জিজ্ঞাসা করলে।

—হয়েছিল।

চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে দেবী বললে, খুব বেঁচে গেছ ব্রজ। তোমাকে অভিনন্দন জানাই। অত গাঁজা তুমি যোগাতে পারতে না। টান দেওয়াটা দেখি নি বটে, কিন্তু কী রকম দম ধরে বসে ছিল। একটি বিন্দু ধোঁয়া কোনও ফাঁক দিয়ে বেরুতে পারলে না। বাহবা!

সবাই হেসে উঠল। ব্রজভূষণ নিজেও। কিন্তু তার মনের মেঘ কাটল না। বললে, ওর বাবাকে একটা তার করে দিলে হয় না?

বিরক্তভাবে দেবী বললে, কিসের জন্যে?

—সন্ন্যিসিটার হাত থেকে ভদ্রলোকের মেয়েটা বেঁচে যায় তাহলে।

—তুমি বলতে চাও সন্ন্যিসিটা ওকে চুরি করে নিয়ে এসেছে?

—না। চুরি করবে কি? লেখাপড়া-জানা বড় মেয়ে। নিজের ইচ্ছেতেই চলে এসেছে নিশ্চয়। কি হয়তো তুকতাক করেছিল।

—দেখা হল কোথায়?

—ঘটনাটা কি জান, সন্ন্যাসী মহারাজ নাকি মস্তবড় একজন তান্ত্রিক সাধু। লোকনাথবাবু ওর শিষ্য। কলকাতা এলে সন্ন্যাসী ওঁর বাড়িতেই উঠত। সেবার এসেও উঠেছিল। এবং দিনকয়েক পরে একদিন প্রভাতে দেখা গেল গুরুও নেই, শিষ্যকন্যাও সেই সঙ্গে উধাও। এর বেশি আমি আর কিছু জানি না।

সন্ধ্যা নেমে এল।

একটা হাই তুলে দেবী বললে, ভৈরবীর উৎপাতে আজ আর বিকেলে কোথাও বেরুনো হল না।

সমস্ত দর্শনীয় দেখা যখন শেষ হয়ে যায়, তখন স্টেশনই চেঞ্জারদের একমাত্র অবলম্বন হয়ে দাঁড়ায়। ট্রেনের যাওয়া-আসাই তখন শেষ দর্শনীয়তে পরিণত হয়।

দেবীদাসদেরও তাই হয়েছে।

এই ছোট শহরে যা-কিছু দেখবার কয়েকদিনের মধ্যেই দেখা শেষ হয়ে গেল। তখন সকাল-বিকেল বেড়াবার স্থান হল স্টেশন। মনের কোণে আশা আছে, এইখানেই হয়তো অভাবিতরূপে কোন একটা চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে। দেখা হয়ে যাওয়াটা আশ্চর্য কিছু নয়। কিন্তু দেখা হয় না।

ট্রেনের পর ট্রেন আসে যায়। কত জায়গায় কত লোক চলেছে। কিন্তু কলের গাড়ি চড়ে ওরাও যেন কল হয়ে গেছে। প্ল্যাটফর্মের লোকদের সঙ্গে ওদের মনের যেন যোগ নেই।

ভৈরবী হওয়ার পরে অঞ্জলির সঙ্গে যেমন ব্রজভূষণের যোগ নেই।

আশ্রমের দিকে ব্রজ কিংবা ওরা কেউই আর যায় নি। যাওয়ার প্রয়োজনই বা কি? সুতরাং ভৈরবীর সঙ্গে আর ওদের দেখা হয় নি। ওরা তাকে প্রায় ভুলে গিয়েছিল। এমন সময় একদিন হঠাৎ স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে ভৈরবীর সঙ্গে দেখা।

ট্রেন আসতে দেরি নেই। ঘণ্টা পড়েছে। ভৈরবী বালিকাটির হাত ধরে প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছে। হয়তো কোথাও যাবে। কি হয়তো কেউ আসবে তার জন্যে অপেক্ষা করছে। একা। সঙ্গে সন্ন্যাসী নেই।

ব্রজ প্রথমে লক্ষ্য করে নি। প্রণতি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করলে। ভৈরবীও লক্ষ্য করে নি। অন্যমনস্কভাবে দাঁড়িয়ে ছিল।

ট্রেন আসছে নাগপুর থেকে। এই ট্রেনটাই কিছুক্ষণ বাদে নাগপুর যাবে। রামটেক এ লাইনের শেষ স্টেশন।

চকিতে ব্রজের মাথায় একটা চিন্তা-তরঙ্গ খেলে গেল : সন্ন্যাসী নেই। এই অপ্রত্যাশিত সুযোগ ছেড়ে দেওয়া হবে না।

সহাস্যমুখে সে ভৈরবীর সামনে গিয়ে নিঃশব্দে দাঁড়াল।

ওকে দেখেই ভৈরবী চমকে উঠল। কিন্তু তখনই হেসে বললে, এখনও রয়েছ?

—হ্যাঁ। এখনও দিন দশেক আছি। তুমি কোথাও যাচ্ছ?

—হ্যাঁ। নাগপুর।

একটু চিন্তা করে ব্রজ জিজ্ঞাসা করলে, যদি অনুমতি দাও, আমি তোমার সঙ্গে যাই।

—কি হবে গিয়ে?

—এই রাস্তাটুকু তোমার সঙ্গে গল্প করার জন্যে।

ভৈরবী হাসল। বললে, কাজের ক্ষতি না হলে আসতে পার।

ট্রেন এসে গেল। লোকজন নামতে লাগল। ব্রজ মোটামুটি ব্যাপারটা বুঝিয়ে প্রণতি আর দেবীর কাছে নাগপুর যাওয়ার অনুমতি নিলে। তারপর দুখানা সেকেণ্ড ক্লাসের টিকিট কেটে এনে যখন প্লাটফর্মে দাঁড়াল, তখন ট্রেনখানা যাত্রার জন্যে প্রস্তুত হয়েছে।

দেবীদের কাছে আর একবার বিদায় নিয়ে ব্রজ ভৈরবী আর তার মেয়েকে নিয়ে গাড়িতে উঠল।

গাড়ি ছাড়তে ব্রজ জিজ্ঞাসা করলে, একদিন ছিল যখন আমার কাছে তোমার গোপন কিছু ছিল না। আজ এই ক'ঘণ্টা সেই দিনটা কী ফিরে আসতে পারে না?

ভৈরবী হেসে বললে, অত ভণিতা কিসের শুনি?

—তোমার আকস্মিক অন্তর্ধানের কারণটা শুনতে চাই।

ভৈরবী চুপ করে কি যেন চিন্তা করতে লাগল। চোখ মুদ্রিত। মুখে বেদনার গাঢ় ছায়া।

চোখ মেলে জিজ্ঞাসা করলে, আর কিছু শুনতে চাও?

—আর একটি কথা: কেমন আছ?

ভৈরবী আবার চোখ বন্ধ করলে। আবাব কি যেন চিন্তা করতে লাগল। মনের গভীরে ডুবে ডুবে কি যেন খুঁজতে লাগল।

অনেকক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করলে, এখানে কোথায় রয়েছ?

—গরীবদাসের ধর্মশালায়।

—ক'দিন তো রয়েছ!

—আরও দিন সাতেক থাকব।

—তারপর অন্য কোথাও যাবে? না, কলকাতায় ফিরবে?

—কলকাতায় ফিরব।

—সেখানে গিয়ে অনেকের কাছে আমার গল্প করবে তো?

—তোমার আপত্তি থাকলে করব না।

—করো না। নিজেদের সমাজ এবং সংস্কারের মাপকাঠিতে বিচার করতে গিয়ে তারা ভুল বুঝবে, ভুল করবে।

—বেশ, কাউকে বলব না একথা।

আবার অনেকক্ষণ চুপচাপ। ভৈরবীর চোখ মুদ্রিত। ব্রজর নিষ্পলক দৃষ্টি। আর বালিকাটি একবার অবাক হয়ে ওদের দুজনের দিকে, আর একবার বাইরের দিকে চাইছে।

ভৈরবী আবার প্রশ্ন করলে, তোমার সঙ্গে যাঁরা এসেছেন, তাঁরা কে? কোন আত্মীয়?

—না। আমার বন্ধু আর তাঁর স্ত্রী।

—তোমার স্ত্রীকে আন নি?

ব্রজ নিরুত্তরে হাসলে।

—বিয়ে করেছ? কর নি? কেন কর নি?

ভৈরবী উত্তেজনায় সোজা হয়ে বসল। কিছুক্ষণ উত্তরের জন্যে অপেক্ষা করে যখন একটু ম্লানহাসি ছাড়া আর কিছু পাওয়া গেল না, তখন আবার চোখ বন্ধ করলে।

নাগপুর কাছে আসতে ভৈরবী জিজ্ঞাসা করলে, তুমি তো আমার সঙ্গে একটুক্ষণ গল্প করবার জন্যেই চলেছ, না নাগপুরে কিছু কাজও আছে?

—না। কোন কাজ নেই

—তাহলে এই ট্রেনেই তো ফিরবে?

—বল তো নাগপুরে থেকে যেতেও পারি। তোমার সঙ্গে ফিরব।

—আমি কাল সকালে ফিরব। পরশু অমাবস্যা। গুরুজীর ক্রিয়াকর্ম আছে। নাগপুরে তাঁর শিষ্য আছে। সেইজন্যে তাঁর কাছে যাচ্ছি। তুমি মিছেমিছি কেন থাকবে?

—থাকবে কোথায়?

—থাকার জায়গার অভাব হয়? খুঁজে নেব একটা। খুকী, তোমার নাম কি?

খুকী এতক্ষণে কথা কইবার একটা লোক পেলে। বললে মাতঙ্গিনী।

ভৈরবী বললে, ও ওখানে শিষ্যবাড়িতেই থাকবে।

—কেন?

—তান্ত্রিক ক্রিয়াকর্ম থাকলে ওকে সেই ক'টা দিন অন্য জায়গায় রাখি। সে তো সাধারণ ব্যাপার নয়।

সেদিন ট্রেনে আর কোন কথা হল না।

কথা হল পরদিন ফেরবার সময়। মাতঙ্গিনী নেই।

ভৈরবী বললে, তোমার দুটো প্রশ্ন। মাতু ছিল বলে কাল তার একটারও জবাব দিতে পারি নি।

ব্রজ বললে, আজ দাও।

—তোমার প্রথম প্রশ্নের জবাব হচ্ছে, ওঁর বিভূতি আমাকে আকৃষ্ট করেছিল, অভিভূত করেছিল। সেই বিভূতির কাছে পৃথিবীর ঐশ্বর্য তুচ্ছ মনে হয়েছিল।

—বিভূতি কিছু পেলে?

এর জবাব না দিয়ে ভৈরবী বললে, দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাব হচ্ছে, এতদিন ভালোই ছিলাম। তোমাকে দেখার পর থেকে মনটা চঞ্চল হয়েছে। ওকি! চমকাচ্ছ কেন? ভয় পেয়ো না। এর মধ্যে প্রেম নেই। চঞ্চল হয়েছি, স্বাভাবিকতার ছোঁয়া পেয়ে।

—তার মানে?

—তার মানে, ভৈরবীর জীবন অস্বাভাবিক জীবন। তার কিছু তো চোখে দেখেই এলে।—বলতে গিয়ে হঠাৎ লজ্জায় তার মুখ আরক্ত হয়ে উঠল। কিন্তু তখনই নিজেকে সামলে নিয়ে বললে—অস্বাভাবিকতার একটা উত্তেজনা আছে, কিন্তু ছায়া নেই।

ব্রজ ব্যাপারটা বোঝবার চেষ্টা করলে। বললে, বেশ তো। ছায়ায় ফিরে এস না কেন?

ভৈরবী হাসলে। বললে, কাল সারারাত সেকথা ভাবি নি মনে করেছ? কিন্তু ফেরা সহজ নয়।

—কেন? গুরুজীর কাছে তোমার কি বন্ধন?

—কোন বন্ধন নেই। আমি তাঁর সাধনার উপচার মাত্র। যজ্ঞের আগুনে ঘি-এর মত আমাকে তিনি তাঁর সাধনায় আহুতি দিচ্ছেন তিল তিল করে। না। বন্ধন নেই, কিন্তু বাধা আছে।

এর পরে আর কোন কথা হল না। সমস্ত পথ দুজনে নিঃশব্দে অতিক্রম করলে। নামবার সময় ব্রজ জিজ্ঞাসা করলে, তোমার বাপ-মার কথা জানতে চাইলে না?

ভৈরবী তাড়াতাড়ি বললে, না, না। কারও কথা বলো না। আমি কারও কথা জানতে চাই না।

সে নেমে চলে গেল কুলীদের মাথায় অনেক জিনিসপত্র চাপিয়ে। যখন টাঙ্গায় উঠল, ব্রজ নিঃশব্দে গাড়ির কাছে গিয়ে দাঁড়াল। ভৈরবী তার দিকে অন্যমনস্কভাবে একবার চাইলে মাত্র। কিন্তু চিনতে পারল বলে বোধ হল না।

এর পরের দিনই ছোট্ট শহরটা তোলপাড় হয়ে উঠল। কি ব্যাপার? না, রামটেক পাহাড়ের আশ্রমে এক বড় ভারি তান্ত্রিক ছিলেন। অমাবস্যার রাত্রে ত্রিশূল দিয়ে কে তাকে খুন করে গেছে!

ভৈরবী? তাঁর ভৈরবী কোথায়?

তাঁরও পাত্তা নেই।

প্রণতি ভয়ে-ভয়ে চুপি-চুপি জিজ্ঞাসা করলে, কি ব্যাপার ব্রজবাবু! জানেন কিছু?

—না। সামান্য অনুমান করতে পারি মাত্র।

—কি অনুমান করেন?

—ছায়ার ডাক।

—সে আবার কি! ছায়া আবার ডাকে নাকি?

—আপনাকে আমাকে ডাকে না। কিন্তু ভৈরবীকে ডাকে। বৈশাখের দুপুর রোদে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে যার চোখ জ্বালা করে, তাকে ডাকে।

বিস্মিত কণ্ঠে প্রণতি বললে, কী আবোল-তাবোল বকছেন ব্রজবাবু! একটু স্পষ্ট করেই বলুন না ছাই!

—স্পষ্ট করে বলব কি বউদি, আমিই কি স্পষ্ট বুঝতে পারছি? বোঝবার চেষ্টা করছি মাত্র।

দেবী বললে, ধর্মশালায় ও-সব আলোচনা থাক প্রণতি। চারিদিকে পুলিস ঘুরছে।

ব্রজভূষণও ব্যস্তভাবে বললে, হ্যাঁ, ও-সব আলোচনা থাক বউদি। চারিদিকে পুলিস তো ঘুরছেই। তাছাড়া, ভৈরবীদের কথায় কাজ কি আমাদের! ওরা তো আমাদের মত সাধারণ মানুষ নয়।

॥ কেন ? ॥

শশাঙ্ক অনেক ভেবে-চিন্তে স্থির করলে, পরীক্ষা যদি তাকে দিতেই হয়, তা হলে চন্দ্রনাথবাবুর সাহায্য নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু সে-পথে বাধাও যথেষ্ট।

প্রথমত চন্দ্রনাথবাবু তারই মত রাজবন্দী হলেও তিনি ভিন্ন দলের লোক। তাকে সাহায্য করতে রাজি হবেন কি না অনিশ্চিত।

দ্বিতীয়ত, এবং দ্বিতীয়তই আসলে প্রথমত—আদিত্য।

আদিত্য তাদের দলের একজন বিশিষ্ট উপনেতা এবং রাজনীতিক্ষেত্রে তার সাক্ষাৎ গুরু। আদিত্যই তাকে এ-পথে টেনে এনেছে এবং আজ যে সে এই বন্দীশালায় সেও আদিত্যের জন্যে। দলের মধ্যে আদিত্যের প্রতিপত্তিও যথেষ্ট। গায়ে তার যেমন অসুরের মত শক্তি, বুকে তার সাহসও তেমনি দুর্বার। ভয় কাকে বলে জানে না। ইতিমধ্যেই তার জমার ঘরে দুঃসাহসিক কাজের তালিকা বেশ দীর্ঘ হয়ে উঠেছে। সেই আদিত্য এই বন্দীশালাতেই রয়েছে। একই ঘরে, পাশাপাশি খাটে। চন্দ্রনাথবাবুর কাছে শশাঙ্কের সাহায্য নেওয়া সে কখনই অনুমোদন করবে না, এ বিষয়ে শশাঙ্ক প্রায় নিশ্চিত!

আদিত্যের নিষ্ঠুরতার যেমন সীমা নেই, স্নেহেরও তেমনি সীমা নেই। শশাঙ্ককে সে অত্যন্ত স্নেহ করে! এই স্নেহের তুলনা নেই। সংসারে তার যে কে আছে আর কে নেই, শশাঙ্ক জানে না। কিন্তু এটা উপলব্ধি করে যে, সংসারী জীবের যে স্নেহ চারিদিকে ছড়িয়ে থাকে, সংসারহীন আদিত্য যেন সেই ইতস্তত বিকীর্ণ সমস্ত স্নেহ একত্রিত করে তারই উপর নিক্ষেপ করেছে। সেই স্নেহের বন্যা অনেক সময় শশাঙ্কের কাছে অত্যাচার বলে মনে হয়।

ভয় তার তাকেই। অথচ—

স্কুল-কলেজে আদিত্য বেশী দূর না পড়লেও কারাগারের ভিতরে ও বাইরে বসে বসে রাজনীতিটা সে কিছু কিছু পড়েছে। সেই জ্ঞানের সাহায্যে এই ক্ষুরধার দুর্গম পথে অকুতোভয়ে চলার শক্তি হয়ত অর্জন করা যায়, কিন্তু তার সাহায্যে শশাঙ্কের পরীক্ষা পাশ করা সম্ভব কিনা না, সন্দেহ আছে।

অথচ দলগত বিদ্বেষ-বিরূপতায় আদিত্যের মন এমনই পরিপূর্ণ যে, তার

কাছে এ সম্পর্কে অনুমতি চাইতেও শশাঙ্কের সাহস হয় না। একবার আদিত্য 'না' বলে দিলে চন্দ্রনাথবাবুর কাছে যাওয়ার আর কোন রাস্তাই থাকবে না।

সুতরাং আদিত্যের অনুমতি না নিয়েই সে একদিন সকালে চা-পানের পর চন্দ্রনাথবাবুর কাছে গিয়ে উপস্থিত হল।

চন্দ্রনাথবাবু কলকাতার একটি কলেজে অধ্যাপনা করতেন। একদিন সূর্যোদয়ের পূর্বেই পুলিস তাঁর বাড়িতে হানা দিয়ে তাঁকে ধরে নিয়ে যায়! সেখান থেকে নানা জায়গায় ঘুরে অবশেষে ভদ্রলোক এখানে এসে অন্তত পুলিসের মধুর আতিথ্যের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছেন।

দল হিসেবে যেমন তিনি আদিত্যদের থেকে স্বতন্ত্র, তাঁদের থাকবার জায়গাও তেমনি স্বতন্ত্র। যৌবনের প্রান্তে এসে পৌঁছেছেন, এমনি কয়েকজন এঁরা যে ওয়ার্ডে থাকেন, সেটা আদিত্যের ওয়ার্ডের মত লম্বা হল নয়—ছোট ছোট সেল। এক একজন এক একটি সেলে থাকেন।

শশাঙ্ক যখন তাঁর কাছে এসে দাঁড়াল, তখন কী যেন একটা কারণে তাঁর সহ-বন্দীরা অন্যত্র গিয়েছিলেন। তিনি একাই লম্বা বারান্দায় পদচারণা করছিলেন। বোধ করি অন্যমনস্কভাবে কী যেন ভাবছিলেনও।

শশাঙ্ককে দেখে প্রথমটা তিনি চমকে উঠলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, "কি খবর?"

নম্রকণ্ঠে শশাঙ্ক বললে, "আপনার কাছেই এলাম।"

—কী ব্যাপার?

—ভাবছি এবারে বি-এ পরীক্ষাটা দিলে কেমন হয়।

চন্দ্রনাথবাবু তখনও ওর আসার হেতুটা ঠিক নির্ণয় করতে পারেন নি। তার জন্যে প্রতীক্ষা করতে করতেই উত্তর দিলেন, ভালোই হয়।

একটু হেসে শশাঙ্ক বললে, "আপনি একটু সাহায্য করলে দিয়ে দিই।"

শশাঙ্কের হাসিটা বড় মিষ্টি। অনেকটা মেয়েদের হাসির মত মিষ্টি।

চন্দ্রনাথবাবু হেসে উত্তর দিলেন, "কার অন্ন-জল কোথায় কতদিন বরাদ্দ আছে, কেউ জানে না। তবে যতদিন তুমি এবং আমি এখানে আছি, ততদিন আমার কাছে যেটুকু সাহায্য পাবার, তা নিশ্চয়ই পাবে, এ আশ্বাস দিতে পারি। তোমার নাম শশাঙ্ক, নয়?"

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—মনে হচ্ছে যেন ওই ওয়ার্ডে তোমাকে দেখেছি আদিত্যবাবুর সঙ্গে। বলে পাশের ওয়ার্ডটার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলেন।

—ওইখানেই থাকি আমি। শশাঙ্ক জবাব দিলে।

—তবে আর কি! বইটইগুলো যোগাড় কর, তারপর এস আমার কাছে। আমারও একটা কাজ জুটবে।

চন্দ্রনাথবাবু হাসলেন।

শশাঙ্ক আশ্বস্ত হয়ে চলে গেল। চন্দ্রনাথবাবু নিঃশব্দে ওর দিকে চেয়ে রইলেন।

চমৎকার ছেলে! যেমন সুন্দর চেহারা, তেমনি মিষ্টি হাসি। আর ওর আশ্চর্য সুন্দর দুটি চোখ। কিন্তু চন্দ্রনাথবাবুর মনে হল, তাতে যেন পর্যাপ্ত পৌরুষের অভাব আছে। একটু যেন মেয়েলী। তা হোক। বাইরের চেহারা অনেক সময় বিভ্রান্ত করে। ওর অনেক দুঃসাহসিকতার বিবরণই সেই প্রবাদ সমর্থন করে।

চন্দ্রনাথবাবু তারপর অভ্যাসবশে ভাবলেন, এই সুযোগে ছেলেটিকে ও-দল ছাড়িয়ে এ-দলে নিয়ে আসতে পারলে মন্দ হয় না। কারাগারের বাইরে দলের জন্যে ভালো ভালো ছেলে সংগ্রহ করায় তাঁর খ্যাতি ছিল। এখানে সে খ্যাতি কি ক্ষুণ্ণ হবে?

সকালে এবং দুপুরে শশাঙ্ক নিয়মিত ভাবে চন্দ্রনাথবাবুর কাছে পড়তে আসতে লাগল। এই সময়টা আদিত্যের দাবাখেলার সময়। দাবার নেশায় এমন মশগুল থাকে যে, ব্যাপারটা কিছুদিন তার চোখেই পড়ল না। শশাঙ্ক পরীক্ষার জন্যে তৈরি হচ্ছে, এটা সে জানে। কিন্তু তৈরিটা কোথায় হচ্ছে, কার কাছে, এটা তার আর খবর নেওয়া হয়ে ওঠে নি।

হঠাৎ একদিন খবরটা তার কানে পৌছল। সঙ্গে সঙ্গে তার কান এবং চোখ রাগে লাল হয়ে উঠল। সমস্ত দেহ ঠক ঠক করে কাঁপতে লাগল। রগের শিরা দুটো ফুলে উঠল। দুই হাতের মুঠি বদ্ধ করে সে অস্থিরভাবে লম্বা হলঘানায় পায়চারি করতে লাগল।

তার দলের লোকেরা ভয় পেয়ে গেল। কিন্তু আদিত্যকে তারা চেনে। সে যখন রাগে তখন ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে, কোন কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। তারা কেউ একটা কথা বলতে সাহস করলে না। শশাঙ্কের কথা ভেবে তারা শঙ্কিত হয়ে উঠল। এ সময় একটিমাত্র লোক তাকে শান্ত করতে এবং শশাঙ্ককে রক্ষা করতে পারতেন, তিনি যোগেনদা। কিন্তু তিনি এখন বহু দূরে, দেউলি বন্দী নিবাসে।

সুতরাং অন্য কোনও উপায় না দেখে তারা ছুটল শশাঙ্কের কাছে। সতর্ক করে দিতে।

শশাঙ্ক তখন বাঁ হাতে বই নিয়ে চন্দ্রনাথবাবুদের ওয়ার্ড থেকে সবে বার হচ্ছে। দরজার বাইরে তার এতগুলি বন্ধুকে দেখে সে প্রথমটা ভয় পেয়ে গেল।

জিজ্ঞাসা করলে, "কি ব্যাপার?"

"ব্যাপার গুরুতর।" ওরা এক সঙ্গে তালগোল পাকিয়ে উত্তেজিতভাবে বলতে লাগল, "আদিত্যদা রেগে আগুন। তুমি এখন ওয়ার্ডে যেয়ো না।"

বিদ্যুৎবেগে এই রাগের হেতু এবং সতর্কতার উদ্দেশ্য তার মনশ্চক্ষে ঝকমক করে উঠল। তবু প্রশ্ন করলে, "কেন?"

সম্পূর্ণ অবান্তর প্রশ্ন। কিন্তু এ ছাড়া আর তার কোন কথাই মুখে এল না।

ওরা কোনরকমে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিতে যে সময়টা নিলে তার মধ্যে শশাঙ্ক নিজেকে সামলে নিলে এবং নিঃশব্দে একটু হেসে তার ওয়ার্ডের দিকে পা বাড়ালে।

ওরা খপ্ করে ওর একখানা হাত চেপে ধরলে। বললে, "দোহাই তোমার, অন্তত এখন যেয়ো না, বিকেলের দিকে যেয়ো।"

—পাগল!

শশাঙ্ক হাত ছাড়িয়ে ওয়ার্ডের দিকেই চলতে লাগল। তার সুন্দর চোখে পৌরুষের একটি স্ফুলিঙ্গও ফুটে উঠল না। কোমল শান্ত চোখ, নির্বিকার।

ধীরে ধীরে সে তাদের ওয়ার্ডের দোতলায় উঠল।

ঘর খালি। এতগুলি লোক কোথায় গেল, তা অনুমান করতে পারে, কিন্তু করলে না। আদিত্য একা পায়চারি করছিল ওদিকে। শশাঙ্ককে হয় সে দেখতে পায় নি, নয় দেখেও দেখে নি। যেমন পায়চারি করছিল, তেমনি করতে লাগল।

শশাঙ্ক নিঃশব্দে তার মাথার গোড়ায় যেখানে বই থাকে সেখানে বইগুলো রেখে আদিত্যের দিকে চাইলে।

"আপনি স্নান করেন নি আদিত্যদা?"

আদিত্য তার কণ্ঠস্বরে যেন শিউরে চমকে উঠল। তারপর ধীরে ধীরে ওর সামনে এসে দাঁড়াল।

সাধারণত তার আক্রমণের পদ্ধতি এমন নয়। সে বাঘের মত অতর্কিতে লাফ দিয়ে তার শিকারের উপর এসে পড়ে। কিন্তু কে জানে কেন, এবারে তার আক্রমণ-পদ্ধতির ব্যতিক্রম হল।

শরীর তার কাঠের মত শক্ত হয়ে রয়েছে, ঠক ঠক করে আর কাঁপছে না। শুধু চোখ দুটোই বাঘের মত জ্বলছে।

শশাঙ্কের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে গম্ভীরভাবে আদিত্য জিজ্ঞাসা করলে, "কোথায় গিয়েছিলি?"

"চন্দ্রনাথবাবুর কাছে।" তার কণ্ঠস্বরে দ্বিধা কিংবা ভয়ের চিহ্নমাত্র নেই।

ওর স্পর্ধায় আদিত্য স্তম্ভিত হয়ে গেল।

"চন্দ্রনাথবাবুর কাছে? কেন?"

"পড়তে।"

"তোমাকে পড়াবার আর লোক নেই?"

"থাকবেন না কেন। কিন্তু তাদের কাছে পড়া যায়, হয়তো শেখাও যায়, কিন্তু পরীক্ষা পাশ করা যায় না। চন্দ্রনাথবাবু সেইটে পারেন, তিনি প্রোফেসর।"

তার এই রুদ্রমূর্তির সামনে এতগুলো কথা একসঙ্গে শশাঙ্ক বলতে পারে, এ যেন আদিত্যের বিশ্বাস করতেই কষ্ট হচ্ছিল। এক মুহূর্ত সে স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে রইল।

তারপর দৃঢ়কণ্ঠে বললে, "কাল থেকে আর তুমি চন্দ্রনাথবাবুর কাছে যাবে না।"

আদিত্য চলে যাচ্ছিল।

শশাঙ্ক ক্ষুণ্ণ কণ্ঠে বললে, "এ আপনার অন্যায় জুলুম আদিত্যদা। আমি—"

তার কথা আর শেষ হতে পারল না। আদিত্য একটা গর্জন করে বিদ্যুৎবেগে ঘুরে দাঁড়িয়েই প্রচণ্ড বেগে তার গালে একটা চড় মারলে।

সেই প্রচণ্ড চড়ের ধাক্কায় শশাঙ্ক টলে উঠল, তার চোখের সামনে থেকে দিনের আলো নিমেষে অন্তর্হিত হল, সমস্ত বাড়িটা যেন একবার দুলে উঠল। সঙ্গে সঙ্গেই 'মাগো' বলে তার অনুভূতিহীন দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। এবং লাফ দিয়ে সেই অর্ধ-অচেতন দেহের উপর বসে আদিত্য তার টুঁটি চেপে ধরলে। আরম্ভ করলে যেখানে-সেখানে এলোপাথারি কিল-ঘুষি।

অনিবার্য মৃত্যু।

কিন্তু এই ঘরের যে-সমস্ত বন্দী এতক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল, ভয়ে ঘরে আসতে পারছিল না, তারা আর থাকতে না পেরে ছুটে এসে পড়ল এবং অনেকে মিলে এক রকম জোর করেই আদিত্যকে সরিয়ে দিয়ে শশাঙ্ককে বাঁচালে।

জ্ঞান হতে শশাঙ্ক চোখ মেলে চারিদিকে চেয়ে ব্যাপারটা বুঝবার চেষ্টা করলে যেন। ঠিক বুঝতে পারলে বলে মনে হল না। এবার উঠবার চেষ্টাও করলে। পারলে না। সকলে ধরাধরি করে তা'কে তার বিছানায় শুইয়ে দিলে! শশাঙ্ক আবার চোখ বন্ধ করলে।

এই সমস্ত সময়টা আদিত্যের কথাটা সবাই ভুলেই গেল। সে তখন সেই মস্ত বড় হলের এক কোণে দেওয়ালে পিঠ দিয়ে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে। সেও বোধ করি শশাঙ্কের মতই ব্যাপারটা বুঝবার চেষ্টা করছিল। পারছিল কি না কে জানে।

একটু দুধ পেলে ভালো হত, কিংবা একটু ফলের রস। কিন্তু এখন এই জেলের মধ্যে কি পাওয়া যাবে?

বিকেলের দিকে শশাঙ্কের জ্বরটা একটু বেশীই মনে হল!

ব্যাপারটা জেলের মধ্যে উভয় দলের ভিতরই জানাজানি হয়েছে! কিন্তু উভয় দলের কারও ইচ্ছা ছিল না এটা জেল-কর্তৃপক্ষের গোচরে আসে। কিন্তু জ্বরটা বাড়তে দেখে সকলেরই ভয় হল। এখন আর ডাক্তার না-দেখালে নয়। সুতরাং ডাক্তারকে খবর দিতেই হল। তিনি অবস্থা দেখেই চমকে উঠলেন। সবই বুঝলেন! কিন্তু একটা প্রশ্নও না করে অবিলম্বে শশাঙ্ককে হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন।

ডাক্তার আশ্বাস দিলেন বটে যে ভয় নেই, কিন্তু শশাঙ্কের বন্ধুদের মন থেকে ভয় গেল না। ওর হাতে এবং বুকে চোটটা যেন বেশী লেগেছে। দুজন বন্ধু নার্সিং-এর জন্য সারারাত্রি থাকবার অনুমতি পেলে।

রাত যখন দুটো তখন শশাঙ্ক একবার চোখ চাইলে। জবাফুলের মত লাল দুটো চোখ।

হঠাৎ চিৎকার করে বললে, "আদিত্যদা গোঁফ-দাড়ি কামিয়ে ফেললেন কেন? চন্দ্রনাথবাবু হবেন বলে? কী আশ্চর্য!"

তখনই আবার চোখ বন্ধ করে চুপ করলে। পরক্ষণেই জড়িতকণ্ঠে কি যেন আবার বিড় বিড় করে বকতে লাগল।

যারা নার্স করছিল তারা ওর মুখের উপর ঝুঁকে পড়ল। জিজ্ঞসা করলে, "কি বলছ শশাঙ্ক?"

শশাঙ্ক জড়িতকণ্ঠে বললে, "চন্দ্রবাবুর কথা!"

"কি হয়েছে তাঁর!"

"দাড়ি-গোঁফ রেখে আদিত্যদা হয়েছেন।"

শশাঙ্কের আঘাত-স্ফীত ঠোঁট দুটোর প্রান্তে যেন একটা ক্ষীণ হাসির রেখা খেলে গেল।

এর পরে আরও কয়েকবার সে যেন বিড় বিড় করে কী সব বকলে, কিন্তু তার অর্থ বোঝা গেল না।

ভোরের দিকে মনে হল জ্বরটা কমছে। সকাল নাগাদ জ্বরটা সম্পূর্ণ ছেড়ে গেল। ডাক্তার ঠিকই বলেছিলেন, ভয়ের বিশেষ কারণ নেই।

বিকেলে চন্দ্রনাথ এলেন এবং উভয় দলের আরও অনেকে।

চন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করলেন, "কেমন আছ ভাই?"

"ভালো।" শশাঙ্ক সংক্ষেপে জবাব দিলে।

"কাল সকালে তোমাকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেবে শুনছি।"

"তাই তো বলে গেল।"

আর কোন কথা কেউ জিজ্ঞাসা করলে না।

একটু পরে শশাঙ্ক বললে, "পরশুও বোধ হয় সুবিধে হবে না চন্দ্রনাথদা, তার পরদিন থেকে আবার ওড়াশুনা আরম্ভ হবে। কি বলেন?"

"বেশ তো।"

ওঁরা চলে যেতে আদিত্য এল। সকলের শেষে একা। সে যেন এই একটা দিনের মধ্যেই শুকিয়ে গেছে।

হাত জোড় করে বললে, "আমাকে ক্ষমা কর ভাই।

শশাঙ্ক ওর হাত দুটো ধরে ফেলে বললে, "আপনার গায়ে বড় বেশী জোর আদিত্যদা। হাত দুটো যেন লোহার মত শক্ত।"

শশাঙ্ক হাসতে লাগল। কিন্তু আদিত্য হাসতে পারলে না। কথা সে কোন দিনই বেশী বলতে পারে না। আজ যেন একেবারেই না। ও যেন কেমন বোকা হয়ে গেছে।

ওকে দেখে শশাঙ্কের কেমন করুণা হল। তাই ওকে খুশী করবার জন্যে বললে, "ওইখানেই দেখুন, কিছু ফল-টল আছে বোধ হয়। থাকলে, একটা ফল ছাড়িয়ে দেবেন?"

আদিত্য যেন কৃতার্থ হয়ে গেল। তখনই একটা ফল ছুরি দিয়ে ছাড়িয়ে ছোট ছোট করে কেটে ওর মুখে দিতে লাগল।

শশাঙ্ক নিঃশব্দে খেতে খেতে এক সময় বললে, যেন আনমনেই, "আবার তো ক'দিন পরেই চন্দ্রবাবুর কাছে পড়া শুরু করব। আবার অদৃষ্টে কি আছে কে জানে।"

আদিত্যের হাতের ছুরি থেমে গেল। ফল কাটা বন্ধ হয়ে গেল।

লক্ষ্য করে শশাঙ্ক বললে, "হাতের ছুরিটা একটু দূরে সরিয়ে রেখে দিন আদিত্যদা। ওটা যদি বুকে বেঁধে তাহলে পরীক্ষা দেওয়ার ঝামেলা চুকে যাবে চিরদিনের মত।"

অপ্রস্তুতভাবে হেসে আদিত্য ছুরিটা যেখানে ছিল সেখানে রেখে দিয়ে এল। ফিরে এসে গম্ভীরভাবে বললে, "তুই চন্দ্রবাবুর কাছে পড়তে যাস, এটা আমি পছন্দ করি না।"

"কেন করেন না? দলগত কারণে?"

"না।"

তবে?"

খানিকটা চিন্তা করে আদিত্য বললে, "তাও ঠিক বলতে পারব না। আমি ছাড়া আর কারও কাছে কোন প্রয়োজনে তুই যাস্, এ আমি সইতে পারি না।"

শশাঙ্ক বিস্মিতভাবে ওর মুখের দিকে চাইলে। জিজ্ঞাসা করলে, "তার মানে?"

"মানে জানি না। কিন্তু খুব কষ্ট হয় আমার। সমস্ত শরীর জ্বালা করতে থাকে।"

"তাহলে আপনি কি চান, আমি পরীক্ষা দেব না?"

একটু দ্বিধা করে দৃঢ়কণ্ঠেই আদিত্য বললে, "তা চন্দ্রবাবুর কাছে পড়া বুঝিয়ে না নিলে যদি তোর পরীক্ষা দেওয়া বন্ধ হয়, তাহলে থাক না পরীক্ষা দেওয়া।"

শশাঙ্ক এই অদ্ভুত কথা শুনে অবাক হয়ে আবার ওর মুখের দিকে চাইলে।

লক্ষ্য করে কোমল কণ্ঠে আদিত্য বললে, "তোর জন্যে আমি না করতে পারি এমন কাজ নেই। আর আমার জন্যে পরীক্ষা দেওয়া বন্ধ করা তোর পক্ষে এমনই কঠিন?"

শশাঙ্ক এবার ধীরে ধীরে অথচ দৃঢ় কণ্ঠে বলতে লাগল, "আদিত্যদা, আপনি রাজনীতিক্ষেত্রে আমার গুরু। আপনাকে আমি দেবতার মত ভক্তি করি। আপনার হুকুমে আমিও না করতে পারি এমন কাজ নেই। পরীক্ষা দেওয়া আমাদের জীবনে এমন বড় কাজও নয়। কিন্তু যদি ভেবে থাকেন, আমি আপনার অস্থাবর সম্পত্তি, তা হলে ভুল করছেন। এবং সেই ভুলটা ভাঙবার জন্যেই আমি পরীক্ষা দেব, ওই চন্দ্রবাবুর সাহায্য নিয়েই।"

আদিত্যের চোখ দুটো আবার যেন হিংস্রভাবে জ্বলে উঠল। পেশীগুলো শক্ত হতে লাগল।

সেদিকে লক্ষ্য করেই শশাঙ্ক বলে চলল, "এখানে আমি ছাড়া আরও তো

অনেক শিষ্য আপনার রয়েছে। কই, তাদের উপর এমন জুলুম তো করেন না। শুধু আমার উপরই বা করেন কেন?"

শশাঙ্কের অভিযোগ মিথ্যা নয়। সে কী পরবে, কী খাবে, সমস্ত ঠিক করবে আদিত্য। খেতে বসেছে, হয়তো আদিত্য বললে, "বেগুনের তরকারিটা খাস না শশাঙ্ক! কাল থেকে ক্রমাগত গা চুলকোচ্ছিস।" শশাঙ্ক সবিস্ময়ে বললে, "না তো।" আদিত্য বললে, "হ্যাঁ, চুলকোচ্ছিস। তুই খেয়াল করিস নি।" অতএব রইল সেটা। প্রতিদিন এমনিতর নানান জুলুম তার উপরে চলে। শুধু তারই উপরে, আর কারও উপরে নয়।

সুতরাং আদিত্য এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারলে না। সে অন্য কি একটা বলতে গেল।

বাধা দিয়ে শশাঙ্ক বললে, "ঘণ্টা বেজে গেল। এবারে আপনাকে উঠতে হবে।"

আদিত্য উঠে চলে গেল। মনটা তার ভারী হয়ে গেছে।

এর পরদিনও কিন্তু শশাঙ্ক হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলে না। এই ঘটনা সম্পর্কে জেল কর্তৃপক্ষ তদন্ত আরম্ভ করলেন। অবশ্য সমস্তই তাঁরা পরোক্ষভাবে জানতে পারলেন। কিন্তু কোন প্রমাণই পাওয়া গেল না। ফল শুধু এই হল যে, আদিত্য অন্য জেলে স্থানান্তরিত হল। এবং বিদায়কালে শশাঙ্কের সঙ্গে তাকে দেখা করতেও দেওয়া হল না।

সে চলে যাবার পরে শশাঙ্ককে তার ওয়ার্ডে নিয়ে আসা হল।

ভাবটা এই যে, আদিত্য অত্যন্ত হিংস্র প্রকৃতির বিপ্লবী। কোন রাজনৈতিক মতভেদের জন্যেই হোক অথবা অন্য কোন কারণেই হোক, শশাঙ্কের উপর সে চটে গেছে। সুতরাং উভয়কে এক জেলে রাখা শশাঙ্কের পক্ষে নিরাপদ নয়।

তাই নিয়ে উভয় দলের মধ্যেই খুব হাসাহাসি পড়ে গেল।

কিন্তু এখানেই এর শেষ হল না।

যেদিন আদিত্য চলে গেল, তার পরের দিনই খবরের কাগজে তার মৃত্যু-সংবাদ প্রকাশিত হল। চলন্ত ট্রেন থেকে ঝাঁপ দিতে গিয়ে সে মারা গেছে।

পুলিস আদিত্যের হিংস্রতা সম্বন্ধে আর এক প্রস্থ গবেষণা করলে। তারা বললে, মুক্তির জন্য নয়, শশাঙ্ককে মারবার জন্যেই সে এইভাবে পুলিসের হাত থেকে পালাবার চেষ্টা করেছিল।

এবার কিন্তু আর উভয় দলের মধ্যে হাসাহাসি পড়ল না। সকলেই বুঝলে, আদিত্য আত্মহত্যার দ্রুততম এবং নিশ্চিততম পথ বেছে নিয়েছে। কিন্তু কেন?

॥ বলদেব রায় ॥

বলুদার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের দিনটিকে কখনও ভুলব না। কিন্তু তার আগের কথাটা যতখানি সম্ভব সংক্ষেপে আগে বলা দরকার।

সবে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হয়েছি। পরীক্ষার ফল এতই ভালো হয়েছিল যে, প্রায় সকল সময়ই সকলের দৃষ্টি যে আমার উপর, তা বেশ অনুভব করতে পারি। গর্ব বোধ করি নে তা নয়, কিন্তু তার সঙ্গে মধ্যবিত্ত গ্রাম্যবালকের সংকোচও জড়িয়ে থাকে।

এই অবস্থায় অদ্ভুত একটি ছেলে আমার চোখ ধাঁধিয়ে দিলেন। তিনি পড়তেন আমার তিন ক্লাস উপরে। টকটক করছে গায়ের রঙ। যেন তাঁরই সঙ্গে মানান করে মাথার চুলও ঈষৎ কপিলবর্ণ। চোখ দুটো ছোট, কিন্তু তীক্ষ্ণ। আর শীর্ণ মুখের উপর ঋজু নাসিকা। নিতান্ত সাদাসিদে পোশাক। তবু এ চেহারা চোখে পড়বেই।

শুনলাম বি-এতে যে চিনুদা ফার্স্ট হবেন, এ বিষয়ে ছাত্রমহলের সন্দেহের লেশমাত্র ছিল না।

একই মেসে থাকি, অথচ পরিচয়ের সুযোগ হয় নি। কতবার দেখা হয় কলেজে, মেসে। কিন্তু লোকটির মধ্যে কেমন একটা ঔদাসীন্য, কিছুতে তাঁর ঘরে যেতে সাহস হয় না।

অবশেষে নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে তিনিই একদিন আমার ঘরে এলেন। বসলেন না, দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়েই যেন পরিচয়ের প্রাথমিক পবটা শেষ করলেন। তারপরে মাকড়সা যেমন অতি সুকৌশল লূতাতন্তু দিয়ে তার শিকারকে বেঁধে ফেলে, তিনিও তেমনি করে দেখতে দেখতে আমাকে জড়িয়ে ফেললেন।

পূজার ঠিক আগে। একদিন বললাম, সামনের কটা মাস আর ওর মধ্যে যাবেন না চিনুদা। পরীক্ষাটা হয়ে যাক, তারপরে বরং—

চিনুদা হেসে বললেন, তারপরে কী সুবিধা হবে?

—সুবিধা নয়। পরীক্ষায় ফার্স্ট আপনি হবেনই। তারপরে—

—তারপরে গায়ে আর গুলি বিঁধবে না?

চিনুদা অট্টহাস্য করে উঠলেন: মৃত্যু সাগরের বেলাভূমিতে কত চকচকে নুড়ি-ঝিনুক পড়ে থাকে। যাত্রীদের সেদিকে চাইবার অবকাশ কোথায়?

অবকাশ রইলও না। টেস্ট পরীক্ষার দিন-কয়েক আগে চিনুদা আমাকে ডেকে চুপি চুপি বললেন, অচ্যুত ভাই, 'বন্দরের কাল হল শেষ'। তোমাকে কিন্তু মাঝে মাঝে আমার দরকার হতে পারে। আমার হাতের লেখা তুমি চেন। সেই লেখায় 'অর্চনা' এই সংকেত যে তোমাকে দেখাবে, তার সঙ্গে কথা বলবে। আর সে যা বলবে তাই করবে।

সেই রাত্রে চিনুদা গা-ঢাকা দিলেন।

তারপরে টেস্ট পার হয়ে গেল। শেষ পরীক্ষাও আসন্ন। আমাদের মেসে শীতের নিস্তব্ধ রাত্রি পরীক্ষার্থীদের পড়ার গুঞ্জনে গুঞ্জরিত। সেই গুঞ্জনে কত রাত্রে আমার ঘুম ভেঙে যায়। চিনুদার জন্যে মনের স্নায়ুগুলো টনটন করে ওঠে। শীতের রাত্রেও দুশ্চিন্তায় কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে। পাশের জানলাটা খুলে দিই। বাইরে শীতের জ্যোৎস্না কেমনতর রহস্যময় হাসে।

আরও কিছুদিন পরে, কলেজ থেকে বেরুচ্ছি, এমন সময় একটি অপরিচিত ছেলে আমাকে ডাকলে। পার্কে গিয়ে সেই সংকেত দেখালে : অর্চনা।

জিজ্ঞাসা করলাম, কী আদেশ ?

ছেলেটি বললে, কাল রবিবার। পরশু-তরশুও ছুটি আছে বোধ হয় ?

—আছে।

—তা হলে মেসে বইগুলো রেখে আসুন। বলে আসবেন বিশেষ দরকারে দু-তিন দিনের জন্য দেশে যাচ্ছেন। আমি আপনার জন্য এইখানে দাঁড়িয়ে রইলাম।

তথাস্তু। প্রশ্ন নিষিদ্ধ। মেসে বইগুলো রেখে ফিরে এলাম এবং তাঁর সঙ্গে নিঃশব্দে রওনা হলাম, কোথায় কে জানে !

কিছুক্ষণ পরে এসে পৌছলাম লিলুয়ার এক বাগানবাড়িতে। সামনের ফটক দিয়ে নয়, পেছনের পাচিল টপকে।

আমার সঙ্গী (কী যে তাঁর নাম সেদিনও জিজ্ঞাসা করি নি, আজও জানি নে) সেইখান থেকে হাতের তালু বাজিয়ে এক রকম সংকেত করতে বাড়ির একটা জানলা খুলে গেল এবং সেই জানলা টপকে মোমবাতি হাতে একজন আমাদের দিকে এগিয়ে এল।

চিনুদা।

আমাকে দেখে বললেন, এসেছিস !

কণ্ঠস্বর চিন্তাক্লিষ্ট মনে হল। বললেন, সাবধানে আয়। বাড়িটায় সাপের বড় উপদ্রব।

তারপর এই পদ্ধতিতে জানলা টপকে আমরা সবাই ভিতরে ঢুকলাম। বোঝা গেল, যাওয়া-আসার এইটেই সদর রাস্তা।

নিম্নকণ্ঠে চিনুদা বললেন, বলুদার অসুখটা খুব বেশী। কাল তো সারা রাত ভুল বকেছেন আর ছটফট করেছেন। ভাবলাম, চার দিন চার রাত্রি এমনি চলছে। আজও যদি তাই চলে আমরা দুজনে সামলাতে পারব না। তাই তোকে খবর পাঠালাম।

বলুদা! আজ প্রথম তাঁকে দেখব, সে কি এই নির্জন নড়বড়ে পড়ো বাড়িতে, অন্ধকার রাত্রিতে! আনন্দে, বিস্ময়ে অথবা উত্তেজনায় জানি নে, আমার সর্বাঙ্গ কেমন যেন থমথম করতে লাগল।

কোনক্রমে জিজ্ঞাসা করলাম, এখন কেমন আছেন?

—জ্ঞান হয়েছে। উত্তাপও অনেক কম। তুমি এইখানে থাক। ও-ঘরে যেও না। হঠাৎ অপরিচিত লোককে দেখলে উত্তেজিত হতে পারেন।

যে ঘরে দাঁড়িয়ে ছিলাম তার পাশের ঘরেই বলুদা। ঘরের এক কোণে, ওঁর শিয়রের দিকে একটা মোমবাতি মিটমিট করে জ্বলছে। দুই ঘরের মধ্যে এককালে দরজা ছিল। এখন নেই। সেই মিটমিটে আলোয় দেখলাম, বলুদা নিস্তব্ধ শুয়ে। নিঃশ্বাসের তালে তালে বুকটা দুলছে। চোখ বন্ধই বোধ হয়, ঠিক বোঝা গেল না।

ওই বলুদা! বিখ্যাত বিপ্লবী নেতা বলদেব রায়! যাঁর নামে যুব-মন ঈথরের মত তরঙ্গায়িত হয়ে ওঠে। ওইখানে শুয়ে, বিনা চিকিৎসায়, বিনা পথ্যে কিসের প্রতীক্ষায় কে জানে? নিস্তব্ধ মৃত্যুর, না চঞ্চল জীবনের? এই জরাজীর্ণ গৃহের জীর্ণতর শয্যায় বাংলার তথা সমগ্র ভারতের কোন্ ইতিহাস রচিত হচ্ছে তাই বা কে জানে!

কিন্তু থমথমে রাত্রিও অবশেষে প্রভাত হল।

বলুদা উঠে বসে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করলেন, আমার রিভলবারটা কী হারিয়ে ফেললাম চিনু?

—আজ্ঞে না। আমি রেখে দিয়েছি।

চিনুদা রিভলবারটা ওঁর হাতে দিয়ে দিলে।

সেটিকে পাশে সযত্নে রেখে অন্যমনস্কভাবে একবার নিজের ললাটে হাত বুলোলেন। কী যেন একটু ভাবলেন।

তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, একটু চায়ের ব্যবস্থা হতে পারে চিনু? ক্ষিদে পেয়েছে ভয়ানক।

—দেখি কী করা যায়। মুখটা ধুয়ে নিন আগে। জল দিচ্ছি।

দুটি মুড়ি ছিল আধ-বাসি। চিনু তাই দুটিখানি দিয়ে সহাস্যে বললে, দেখুন চলবে কি না।

গোগ্রাসে তাই চিবুতে চিবুতে বলুদা বললেন চলবে না! বল কী হে! এর চেয়ে খারাপ জিনিসও চলত।

বললেন, গত কটা মাসে কী যে খেয়েছি আর কী খাই নি বলতে পারব না। পেটের জ্বালায় গাছের কচি পাতা পর্যন্ত খেয়েছি। বেশ লাগে হে! মন্দ লাগে না। বনকুল, শাঁক, আলু জাতীয় কন্দ, গাছের পাতা, ঝরনার জল—নিতান্ত খারাপ নয়।

—তা হলে এই পাজি অসুখটা বোধ হয় ওই সব খেয়েই?—চিনু সহাস্যে বললে।

—বিচিত্র নয়!—বলুদা তাঁর ফোকলা দাঁত বের করে হাসতে লাগলেন।

এই ভাঙা দাঁতের একটা ইতিহাস আছে, জানিস অচ্যুত!—বলেছিলেন অন্য সময়। সার্জেণ্টের ঘোড়ার লাথিতে ও দুটি গেছে। লাথি খেয়ে উনি ছিটকে গড়িয়ে পড়লেন একটা আধ-মজা পুকুরের জলের ধারে। বুঝলেন, আর রক্ষা নেই। পকেটেই ছিল পটাশিয়াম সায়ানাইড। সমস্তটা ঢেলে দিলেন মুখে।

—পটাশিয়াম সায়ানাইড! কী সর্বনাশ!—বলতে আমার চোখ নিশ্চয় বড় বড় হয়ে উঠেছিল।

—সর্বনাশ খুব বেশী হয় নি। কারণ ওটা অক্সিডাইজ্‌ড্‌ হয়ে গিয়েছিল। মরলেন না, কিন্তু স্বাস্থ্যটা ভেঙে গেল।

—আর সেই সার্জেণ্ট?

—তার কি অপেক্ষা করার ফুরসত ছিল? সে চলেছিল বলদেব রায়কে গ্রেপ্তার করতে!

—কিন্তু তারপরে মাসখানেক বেশ আরামে কেটেছিল হে! যখন টাইফয়েড হয়েছিল।

—টাইফয়েড! তাও হয়েছিল নাকি?—চিনুদা জিজ্ঞাসা করলেন।

—হবে না? বাঃ!—বলুদা বললেন, আমার বিশ্বাস ওটা রীতিমত টাইফয়েডই। শরীরটা ক-দিন থেকে খারাপ লাগছিল। গাছের পাতা ছাড়া আর কিছু পেটেও যায় নি। মধ্য-ভারতের একটা জঙ্গলে। অনির্দিষ্টভাবে চলেছিলাম। পথে একটা ছোট্ট পাহাড়িয়া নদী পড়ল। হেঁটেই পার হব। জলে নেমে শরীর যেন স্নিগ্ধ হল। সেই ঠাণ্ডা জলে হাত-মুখ ধুতে লাগলাম।

এই পর্যন্ত মনে পড়ে। তারপরে দেখি, জঙ্গলের মধ্যে একটা পর্ণকুটিরে শুয়ে। আমার পাশে কটি সাঁওতাল ছেলে এবং মেয়ে। ব্যাপারটা বোঝবার জন্য চোখ বন্ধ করলাম।

বলুদার কাছে ব্যাপারটা কি এখনও স্পষ্ট নয়? এখনও তিনি চোখ বন্ধ করলেন কেন?

বলুদা বলতে লাগলেন, ডাক্তার নয়, কবরেজ নয়। কত কি পাতার রস ওরা খাইয়েছিল। আর ওদের দেবতার কাছে দিয়েছিল কত মোরগ বলি। সেই মোরগের সুপ ছিল পথ্য। কী যত্নই না করেছিল ওরা!

এতক্ষণে বলুদার চোখ পড়ল আমার উপর।

সেই দৃষ্টি অনুসরণ করে চিনুদা সঙ্গে সঙ্গে বললে, ও অচ্যুত। আপনার অবস্থা দেখে কাল ওকে আনিয়েছি।

—তা ওখানে বসিয়ে রেখেছিস কেন? অমন অপাংক্তেয় করে? এদিকে এস ভাই।

কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। তারপর প্রণাম করে পায়ের ধুলো নিলাম।

আমার মাথায় মুখে হাত বুলিয়ে বললেন, বাঃ, বেশ!

জিজ্ঞাসা করলাম, আশীর্বাদ করবেন না?

—করব বই কি। কিন্তু আমার তো একটিই আশীর্বাদ, সে কি তুমি সইতে পারবে?

—পারব!—অহঙ্কারে আমার বুকটা যেন ফুলে উঠল।

—তা হলে আশীর্বাদ করি, মরতে শেখ। মৃত্যুর মধ্যেই জীবনের উৎস। বাঙালীকে যদি বাঁচাতে হয়, তা হলে তাকে মরতে শিখতে হবে।

বলুদার চোখ দুটো যেন নেকড়ে বাঘের মত জ্বলতে লাগল। আর সেই দৃষ্টির সামনে আমি যেন মন্ত্রমুগ্ধের মত আচ্ছন্ন হয়ে বসে রইলাম।

এর পরে অনেক কাল বলুদাকে দেখি নি। গা-ঢাকা দিয়ে তিনি কোথায় কোথায় যেন ঘুরেছেন, সে কহিনীর কিছু কিছু পরে তাঁর মুখে শুনেছি। তখন অসহযোগ আন্দোলনের জোয়ার এসেছে। এবং অন্যান্য অনেকের মত তিনিও গুপ্ত বিপ্লব ছেড়ে তার মধ্যে ঝাপিয়ে পড়েছেন।

এ তাঁর কর্মবহুল জীবনের আর একটি অধ্যায়।

কিন্তু এই অধ্যায়ে আমার সঙ্গে তাঁর যোগ খুব ঘনিষ্ঠ ছিল না। আমার কেমন মনে হতো, অনেক কাছের আকাশে যিনি ছিলেন মস্ত বড় জ্যোতিষ্ক,

অনেক দূরের আকাশে লক্ষ কোটি তারার মধ্যে তাঁকে যেন ঠিক চেনা যাচ্ছে না।

বিপ্লব শেষ হয়ে গেছে। জেল টপকাতে গিয়ে পুলিসের গুলিতে চিনুদা মারা গেছেন। আমি পুলিস কোর্টে ওকালতি করি। তারই ফাঁকে ফাঁকে অনেক দূরে দূরে বলুদার সঙ্গে কখনও কখনও দেখা হয়।

তারপরে একদিন অসহযোগও শেষ হল। বলতে গেলে, এক রকম অপ্রত্যাশিতভাবেই ভারতবর্ষ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে ফাঁকতালে স্বাধীনতা পেয়ে গেল। সেই বাধাবন্ধহীন উন্মত্ত হুল্লোড়ের মধ্যে হ্যারিসন রোড আর চিত্তরঞ্জন অ্যাভিন্যুর মোড়ে একবার যেন মনে পড়ল বলুদাকে।

সামনে-পিছনে ডাইনে-বাঁয়ে ভিড়ের টাল সামলাচ্ছি তখন। তার মধ্যে তপস্বী বলদেবকে মনের মধ্যে পরিপূর্ণ করে ধরা সম্ভব নয়। ধরলাম কাটা-কাটা ছেঁড়াছেঁড়াভাবে।

কাকে? যে বলদেব এক ছিলেন, বহু হয়েছেন, তাঁকে?

না, তাঁকেও না।

বোধ হয় বলদেব রায়কেই নয়। বলুদাকেও নয়। স্পষ্ট শুনলাম, কানের কাছে একটা উচ্ছ্বসিত কণ্ঠস্বর: টাইফয়েড হবে না? বাঃ!

সেই মোরগের স্যুপ ছিল পথ্য। কী যত্নই না করেছিল ওরা!

অকস্মাৎ নিবিড় জনারণ্য যেন মধ্য-ভারতের গভীর জঙ্গলে পরিণত হল। চিত্তরঞ্জন অ্যাভিন্যুর মাঝখানে মোটর যাতায়াতের জন্যে মাঝে মাঝে এক চিলতে জায়গা ফাঁক হয়ে রাস্তার আলোয় ঝিকমিক করে উঠছিল। আমার বোধ হল, ওটা যেন পথ নয়, মধ্য-ভারতের ঝরনাটি। বলুদা ওর কোন্ ঘাটে নেমেছেন কে জানে। কিন্তু তাঁর সেই ফোকলা দাঁতের হাসি যেন দেখতে পেলাম। যে দাঁত দুটি সার্জেন্টের ঘোড়ার লাথিতে ভেঙে গেছে। অবিকল। এক ফালি হাসি হঠাৎ যেন ঝলমল করে উঠল।

কিন্তু একে কি আপনি বলুদা বলবেন? ওই হাসি কিংবা ওই কণ্ঠস্বর বলুদা? বিদ্যুদ্দীপ্তি কিংবা বজ্রগর্জন কি মেঘ? বড় জোর বলা যেতে পারে ওর মধ্যে মেঘের পরিচয় আছে। তার বেশী কিছু নয়।

অবশেষে সে জোয়ারও কেটে গেল। এর মধ্যে বলুদার খবর রাখি নি বললেই চলতে পারে। বলা যেতে পারে, এবং খুব লজ্জার সঙ্গেই বলা যেতে পারে, মক্কেলের চাপে বলুদা আমার মনের অতলে তলিয়ে গিয়েছিলেন।

এই অবস্থায় হঠাৎ একদিন খবর পেলাম, বলুদার খুব অসুখ।

মনটা খুব চঞ্চল হয়ে উঠল। কিন্তু কোথায় থাকেন তিনি? যাকেই জিজ্ঞাসা করি, কেউ সঠিক জানে না। কেউ বলে বেহালায়, কেউ টালিগঞ্জে, কেউ বা বলে দমদমে।

কী আশ্চর্য! স্বাধীনতা পাওয়ার পরে বাংলা দেশ কি বলদেব রায়ের ঠিকানা হারিয়ে ফেললে!

শেষবার জেলে যাওয়ার আগে চিনুদা একদিন গড়ের মাঠে বেড়াতে বেড়াতে বলেছিলেন, কত কাজ আছে, অচ্যুত, এক জীবনে সব কি করে যেতে পারব?

বলেছিলাম, না-ই বা পারলেন। হাতের মশাল দিয়ে যাবেন পরবর্তীদের হাতে। শেষ তারাই করবে।

—ঠিক। এমনি করেই তো মানুষ অমর হয়ে থাকে এক কাল থেকে অন্য কালে।

কাজ শেষ না করে যাওয়ার কথাই চিনুদা ভেবেছিলেন। কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার কথাটা ভাবেন নি। সেইটেই আরও ভয়ানক। প্রয়োজনের দিক দিয়েই মানুষের কাছে মানুষের প্রয়োজন। প্রয়োজন শেষ হয়ে গেলে লোকে অবলীলাক্রমে বলুদাদের ঠিকানা ভুলে যায়!

অবশেষে বহু চেষ্টার পর বলুদার ঠিকানা পেলাম। বেহালায় নয়, টালিগঞ্জে নয়, দমদমেও নয়,—চেতলার একটা নিভৃত অংশে থাকেন তিনি। একতলা, টিনের চাল, দু-কুঠরী একটা বাড়ি, সেইখানে। কটি ছেলে কোথায় কী একটা কারখানায় কাজ করে, তারাই কি করে তাঁর কাছে আটকে রয়েছে, সেখানেই থাকে এবং তাঁর দেখাশোনা করে।

অনেক গলি ঘুরে, অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করে তাঁর কাছে যখন পৌঁছলাম, তখনও বাইরে অল্প দিনের আলো আছে, কিন্তু সেই নিচু চালার ভিতরটায় অন্ধকার নেমে এসেছে।

একটা ছেলে তাঁর বিছানার কাছে আমার বসবার জন্যে একটা মোড়া দিলে। আর জানলার উপরে রাখলে একটা হারিকেন।

আমাকে দেখেই বলুদা চিনতে পারলেন। উৎসাহের আধিক্যে উঠে বসতেই যাচ্ছিলেন বোধ হয়, কিন্তু দুর্বলতার জন্যে পারলেন না।

বললেন, এই যে! এসে গেছ! বেশ, বেশ!

জিজ্ঞেসা করলাম, কেমন আছেন?

—ভালো। ভালো।—ফোকলা দাঁতে হেসে বললেন।

যে ছেলেটি আমাকে ঘরের মধ্যে নিয়ে এসেছিল, সে আড়ালে মাথা নাড়লে। অর্থাৎ ভালো কিছুই নয়।

ভালো যে নয় তা আমিও বুঝছিলাম। দেহ বিছানার সঙ্গে মিশিয়ে গেছে। বুকের ওঠানামাতে বোঝা যায় নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। গাল ভেঙে গেছে। শুধু চোখ দুটো কোটরের মধ্যে থেকেও জ্বলছে। রোগের যন্ত্রণা একটা আছে নিশ্চয়ই। কিন্তু হাসি দেখলে তা মনেই হয় না।

জিজ্ঞাসা করলাম, এমন একটা হতভাগা জায়গা খুঁজে পেলেন কী করে?

হাসির দমকে বলুদার সমস্ত দেহটা নড়ে উঠল। বললেন, আমিই তো সেই কথাটা তোমাকে জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলাম।

বললাম, আমি খুঁজে পেলাম প্রাণের দায়ে। আপনার তো তেমন কোন দায় পড়ে নি।

কেন হে! জায়গাটা মন্দ কি! অন্তত সেই লিলুয়ার বাগানবাড়ির চেয়ে তো ভালো। এর তো একটা সদর আছে। তার আবার জানলা টপকে যাতায়াত। সাপ অবশ্য এখানেও আছে, সেখানেও ছিল।

চমকে উঠলাম: সাপও আছে নাকি!

—থাকবে না? ওদেরও তো একটা থাকবার জায়গা চাই হে! না পৃথিবী জুড়ে তোমরাই শুধু থাকবে, আর কেউ থাকবে না? এও এক রকমের সাম্রাজ্যবাদী বুদ্ধি।

বলুদা হাসতে লাগলেন। তারপরে ছেলেটির দিকে চেয়ে বললেন, তোর সেই ভালো চা অচ্যুতকে একটু খাইয়ে দিবি, না হাঁ করে দাঁড়িয়েই থাকবি?

ছেলেটি বেরিয়ে যাচ্ছিল। বাধা দিয়ে বললাম, না, না। আমি চা খাব না বলুদা।

—তা বললে আমি ছাড়ব কেন? যাতে ভবিষ্যতে আর কোনদিন এমুখো না আস তার ব্যবস্থা করতে হবে না?

সভয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, এমনিই চা!

—নিশ্চয়। নাম দিয়েছি 'তৃষ্ণাহরণ চা'। এক পেয়ালা খেলে তিন-চার দিনের মধ্যে চায়ের তৃষ্ণা পাবে না। আন দামোদর, এক মগ চা। টুঁটি টিপে ঢেলে দাও ওর গলায়।

এবারে আসল কথাটা পাড়লাম।

বললাম, এখানে তো থাকা চলবে না বলুদা। কাল আপনাকে আমি নিয়ে যাচ্ছি।

—কোথায়?

—হাসপাতালে।

—কেন?

—চিকিৎসার জন্যে, পথ্যের জন্যে, শুশ্রূষার জন্যে। এখানে থাকলে আপনি বাঁচবেন না।

বলুদার মুখের উপর একটা পাতলা ছায়া ঘনিয়ে এল। বললেন, কে বাঁচতে চায়! আমি বলি কী, মরবার পক্ষে এ জায়গাটাই বা মন্দ কী!

—মরবার পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট জায়গা। বলতে পারেন, এখানে একমাস থাকলে বাঁচবার ইচ্ছাই নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু আমরা আপনাকে এখনই মরতে দিতে চাই না।

—কেন? আমাদের প্রয়োজন তো কবে শেষ হয়ে গেছে। সত্যি কথা বলতে কী, মধ্য-ভারতের সেই জঙ্গলেই আমার মরা উচিত ছিল। কিংবা লিলুয়ার সেই বাগানবাড়িতে। মৃত্যুকে ফাঁকি দিয়ে এতদিন বেঁচে থাকাটাই ভুল হয়ে গেছে।

বলুদা মাথা নাড়লেন। বললেন, না অচ্যুত, এখান থেকে আমি কোথাও যাচ্ছি না।

গেলেনও না। মৃত্যুর সঙ্গে মাসখানেক যুদ্ধ করার পর আমাদের হার হল। বলুদা যেখানকার দেহ সেইখানেই রেখে চলে গেলেন।

শোক করি নে। কেনই বা করব? এ সংসারে কে কাকে ধরে রাখতে পারে? কিন্তু সেই দিন চোখের কোণে একটুখানি জল জমে ছিল বুঝি। বুকের ভিতরটা কেমন যেন একবার মোচড় দিয়ে উঠেছিল।

মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা আগে হঠাৎ বলুদা কেমন অস্থির হয়ে উঠলেন। বিকারের ঘোরে কিনা জানি নে, সরু সরু লম্বা আঙুল দিয়ে বিছানায় কী যেন খুঁজতে লাগলেন। ডাকলাম, সাড়া পেলাম না।

কী যেন বিড়বিড় করে বললেন। মুখের কাছে কান নিয়ে গিয়ে শুনলাম, বলছেন, আমার সেই রিভলবারটা? হারিয়ে গেল না কি?

জবাব দিতে পারলাম না। কে জবাব দেবে? চিনুদা তো আগেই চলে গেছেন।

॥ হাসি ॥

এই কাহিনীর যারা পাত্র-পাত্রী, তারা—আরও লক্ষ লক্ষ সাধারণ নরনারীর মত—ইতিহাসের পাতায় বেঁচে নেই। কিন্তু ধরে নেওয়া যেতে পারে, এরা মরে নি, অন্য দেহে বেঁচেই আছে সম্ভবত, যদিও তাদের ঠিকানা জানা নেই।

এদের দেখতে গেলে আমাদের পিছিয়ে যেতে হবে একশো বছর আগের এক গ্রীষ্ম-মধ্যাহ্নে, বাংলার এক অখ্যাত পল্লীতে। ইস্পাতের তলোয়ারের মত ঝকমকে ধারালো রোদ। সেদিকে চাওয়া যায় না। ঝিমুচ্ছে গাছের পাতা এবং পাতার আড়ালে পাখির দল!

মেঝেয় জল-ছড়া দিয়ে শীতল পাটি পেতে দোর বন্ধ করে ঘুমুচ্ছে প্রবীণের দল। ঘুমুচ্ছে গৃহিণীর দল মেঝেয় আঁচল পেতে। পাশে একটি দুটি শিশু নাতি-নাতনী। গল্প বলতে বলতে ঘুমিয়ে গেছে। ঈষদুন্মুক্ত ঠোঁটে সেই অর্ধসমাপ্ত গল্পের রেশটুকু তখনও লেগে রয়েছে যেন।

ঘুম নেই বধূদের। শাশুড়ী-ননদের কঠোর শাসনে এই গ্রীষ্মে তাদের ঘুমুনো নিষেধ। তারা হয়ত কয়েকজন বসে গল্প করছে। নয়ত একা একা তেঁতুল কেটে বিচিগুলো বের করছে।

আর ঘুম নেই বালক-বালিকাদের। রৌদ্র তাদের দগ্ধ করতে পারে না। গুমোট তাদের ক্লিষ্ট করতে পারে না। আগুনের মত তেতে উঠেছে যে গ্রাম-পথ, তাও তাদের জব্দ করতে পারে না। তারা দল বেঁধে চুপি-চুপি ঘুরে বেড়াচ্ছে বাগানে বাগানে, চুরি করে দুটো আম পাড়বার ফিকিরে, নয়ত অন্য কোন ফলের লোভে। পাঠশালা সকালে-বিকেলে বসে। দুপুরে তারা এক ধরনের স্বায়ত্তশাসন পেয়ে যায়। সেটা পুরোপুরি উপভোগ করাই তাদের বাসনা।

আর ঘুম নেই বাবুলালের। ছিপছিপে বলিষ্ঠ গঠনের একটি হিন্দুস্থানী যুবক। বছর কুড়ি-বাইশ বয়স। এইটে তার পসরা নিয়ে বেরুবার সময়। রঙিন গোলাপ-ছড়ি, গুড়ের তৈরি ফাঁপা খেলনা। ছেলেদের অত্যন্ত প্রিয়। এবং এই সমস্ত লোভনীয় সুখাদ্য বিক্রির এইটেই সময়, যখন গৃহিণীরা সুখসুপ্ত, ভাঁড়ার অরক্ষিত এবং ছেলেমেয়েদের পক্ষে চাল-চুরির অবারিত সুযোগ।

জীবিকার্জনের চেষ্টায় বিহার থেকে ব্যবসায়ীর একটা ক্ষীণ স্রোত

আবহমানকাল থেকেই বাংলা মুলুকে প্রবহমান। অনেক দিন আগে এমনি কোন একটা বণিকযূথের সঙ্গে বাবুলালের বাবা মুঙ্গের থেকে বাংলা-মুলুকে আসে। পরিবার দেশেই থাকত। মাঝে-মাঝে সে হয়তো বৎসরে একবার কি আরও বিলম্বে, দেশে যেত। সম্বৎসরের উপার্জিত অর্থে দেশে যেত খামার কিনতে, বিহারের জল-হাওয়ায় শরীরটাকেও ঝালিয়ে নিত, তারপর আবার ফিরে আসত। শেষবার যখন আসে, তখন কী ভেবে বাবুলালকেও সঙ্গে আনে। প্রথম প্রথম বাপের সঙ্গে সঙ্গেই ঘুরত। শীঘ্রই স্বাধীনভাবে বাবার বৃত্তি অবলম্বন করে। বাপের মৃত্যুর পরও তাই করছে।

আর ঘুম নেই রাসমণির।

আট বৎসর আগে যখন রাসমণির বয়স ছিল নয়, তখন বাবা তাকে গৌরীদান করে পুণ্যসঞ্চয় করেছিল! পরের বছরই সে বিধবা হয়। তারপরে আর শ্বশুরবাড়ি যায় নি। সেখান থেকে কেউ তাকে নিয়ে যেতেও আসে নি।

তার ঘুম আসে না। মা-বাবা দুজনেই বেঁচে। দিবানিদ্রায় তার বাধা নেই। তবু ঘুম আসে না। চেষ্টা করলেও না। কিছুদিন থেকে কী যে তার হয়েছে, বাড়ির সবাই যখন দোর বন্ধ করে অন্ধকারের স্নিগ্ধতায় নিদ্রামগ্ন, সে দাওয়ার একটা নিরিবিলি কোণে বসে কিসের যেন প্রতীক্ষা করে।

ঠুং ঠুং ঠুং ঠুং।

ঘণ্টা বাজিয়ে মাথায় কাঠের ডালা আর বাঁ বগলে সেই ডালা বসাবার মোড়া নিয়ে এই সময়ে আসে বাবুলাল। অনেক দূর থেকেই গ্রীষ্মের নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে তার ঘণ্টার শব্দ শোনা যায়। বোঝা যায়, সে কতদূরে।

রাসমণি তখনই গায়ে ভাল করে শাড়িটা জড়িয়ে উঠে বসে। বাবুলাল কুমোরপাড়া পেরিয়ে স্যাকরাপাড়ার মোড়ে ডালাটা একবার নামায় কেষ্টপদর ঘরের ছায়ায়। এখানে তার পসরা কিছু বিক্রি হয়। তখন ঘণ্টা বাজে না।

রাসমণি অপেক্ষা করে। যেই আবার ঘণ্টা বেজে ওঠে, রাসমণি সদর দরজা একটু ফাঁক করে দাঁড়ায়। একটি চোখ দিয়ে দেখে—না কি কান দিয়ে?—বাবুলাল কতদূর এল।

মিনিট দুয়েকের পথ।

চোখে চোখ পড়তে দুজনেই মিষ্টি একটু হাসে! মাথার পসরা রাসমণির

সদরদরজার সামনে নামায় বাবুলাল। মাথার গামছা খুলে ছোট্ট দাওয়াটুকুর উপর বসে মুখের ঘাম মোছে। এই রোদে ওর মুখ লাল হয়ে উঠেছে। গামছা ঘুরিয়ে একটু হাওয়া খায় বাবুলাল।

রাসমণি নিঃশব্দে অপেক্ষা করে। তার চোখের কোণে হয়ত একটু উদ্বেগ, ঠোঁটের ফাঁকে হয়ত একটু হাসি থাকে। কিন্তু বাবুলাল হাসতে পারে না তখন। তার মাথা এবং সমস্ত দেহ দিয়ে একটা গরম বাষ্প বেরুচ্ছে তখন। মিনিট পাঁচেক গামছার হাওয়ায় দেহ কিছুটা শীতল হলে তখন রাসমণির দিকে চেয়ে হাসে।

রাসমণি জিজ্ঞাসা করে, "জল আনি" ?

"আন।"

ভাঁড়ার ঘরের অন্ধকার কোণের জালায় যে ঠাণ্ডা জল, একটি কাঁসার ঘটিতে করে তাই নিয়ে আসে। দাওয়া থেকে নেমে নর্দমার ধারে বাবুলাল অঞ্জলি পাতে। এক ঘটি জলে হয় না। প্রথম ঘটির জল তার ধূলিমলিন হাত-মুখ, উত্তপ্ত কর্ণমূল, চোখ, ললাট ধুতেই শেষ হয়। দ্বিতীয় ঘটির জলে তৃষ্ণা নিবারণ।

তারপর সুস্থ হয়ে ঘণ্টা বাজায়। ছোট ছোট ছেলেমেয়ের দল জোটে বাড়ি থেকে চুরি করে আনা চাল নিয়ে। একটা নারকোলের মালায় চাল মেপে থলিটায় রাখে এবং যার-যেমন চাল সেই অনুযায়ী কাউকে গোলাপ-ছড়ি কাউকে বা অন্য জিনিস দেয়।

রাসমণি আধ-কপাটি সদর দরজায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে স্মিতমুখে ওর ব্যবসা করা দেখে। এক একদিন দুষ্টু ছেলের দল পণ্যের হ্রস্বতা নিয়ে বাবুলালকে বেজায় নাজেহালও করে। রাসমণি তখন এগিয়ে এসে ওদের বিরোধের একটা সন্তোষজনক মীমাংসা করে দেয়।

ওর ছোট ভাইটি শিবু পাশেই দাঁড়িয়ে থাকে নিঃশব্দে। তারা গরিব, রোজ রোজ চাল দিয়ে গোলাপ-ছড়ি কিনতে পারে না। কিনতে না পারলে গোলাপ-ছড়ির অভাবে জীবন বৃথা মনে হয় তার। অন্য ছেলেদের কেনা দেখে আর ছটফট করে। বাবুলাল সেদিন যাওয়ার সময় একখানা গোলাপ-ছড়ি সহাস্যে ওকে উপহার দিয়ে যায়।

"কাল পয়সা দিও।"

বলে রাসমণির দিকে চেয়ে বাবুলাল হেসে চলে যায়।

শিবুর বন্ধুরা বাবুলালের এই পক্ষপাতিত্বে ঈর্ষান্বিত হয়। তারা জানে,

কাল পয়সা দেওয়াটা কিছুই নয়। মাঝে মাঝেই বাবুলাল এমন খয়রাতি করে। গোপাল-ছড়ি ধারে বিক্রি নেই।

বলে, "লোকটা তোদের খুব ভালবাসে। না রে?"

গোলাপ-ছড়িটা মনোযোগের সঙ্গে লেহন করতে করতে শিবু প্রথমে বলে, "হ্যা।" তারপর বলে, "আমরা জল দিই যে!"

ওর নাম ছেলেরা কেউ জানে না। জানবার প্রয়োজনও বোধ করে না। ওদের সম্পর্ক লোকটির সঙ্গে নয়, তার গোলাপ-ছড়ির সঙ্গে। গোলাপ-ছড়িওলা বললেই সে প্রয়োজন মেটে। কাছেই কোন একটা গ্রামে বোধ হয় ওর আস্তানা। কিন্তু সেটা যে কোথায়, সে-কথা জানবার কোন কৌতূহল তাদেব জাগে না।

এ-গ্রামে ও রোজ আসে না। একই গ্রামের ছেলেরা রোজ রোজ গোলাপ-ছড়ি কেনার পয়সা পাবে কোথায়? এক একদিন এক এক গ্রামে যায়। তবে এ-গ্রামটা বড়, এই গ্রামেই বেশী আসে।

এক একদিন দু-একটা ছোট গ্রাম দূরেও এ-গ্রামে আসে। যেদিন খুব ক্লান্ত থাকে সেদিন আর রাসমণির দেওয়া এক ঘটি জলেই শ্রান্তি-নিবারণ হয় না। সেদিন পসরা পাশে নামিয়ে রেখে ওদের রাস্তার দিকের চাতালে মাথায় গামছাটা দিয়ে শুয়ে পড়ে।

ঘুমোয় না! ঘুমোবার উপায় নেই। যা দুষ্টু পাড়ার ছেলেরা, ঘুমিয়ে পড়লে ডালাটাই উধাও হয়ে যাবে।

বাবুলাল ঘুমোয় না। রাসমণিও সংলগ্ন ঘরের দরজা অল্প একটু খুলে তার আড়ালে বসে। দুজনে অনেক গল্প হয়:

"তুমি শ্বশুরবাড়ি যাও না রাসু?"

"সেখানে কার কাছে আর যাব?"

"মাঝে মাঝেও যাও না?"

"না।"

"ওরা নিতে আসে না?"

"না।"

বাবুলাল বিষণ্ণ মুখে কী যেন ভাবে। বলে, "তোমার যখন শাদি হয় তখন কত উমর ছিল?"

"ন বছর।"

"কিছু ইয়াদ হয় না ?"

"না।"

রাসমণির আনত মুখের দিকে বাবুলাল গভীর সহানুভূতির সঙ্গে চেয়ে থাকে। ভারি কষ্ট হয় তার।

বলে, "আমাদের দেশে তোমার মত লেড়কীর আবার শাদি হয়।"

"বামুনের ঘরেও ?"

"না। অন্য জাতের হয়।

"আমাদের দেশে হয় না।"

রাসমণিও ওদের দেশের কত কথা জিজ্ঞাসা করে ?

"তুমি দেশে যাবে না গোলাপ-ছড়িওলা ?"

"কী করে যাই ? রুপেয়া-পয়সা কামাই হবে তবে তো !"

"সেখানে কে আছে তোমার ?"

"মা আছে, ভাই আছে দুটো, বাহন আছে একটা, আর ভঁইস আছে দুটো।"

"বহিনের বিয়ে হয়নি ?"

"বাত্ চলছে। লেকেন রুপেয়া না নিয়ে গেলে তো হবে না।"

"আর ভাই কী করে ?"

"ভঁইস চড়ায় ছোটটা, আর বড়টা ক্ষেতে খাটে।

"কতদিন দেশে যাও নি তুমি ?"

"দু'বরষ।"

"কী সর্বনাশ ! যেতে ইচ্ছে হয় না ?"

"ইচ্ছে তো হয়, মগর একঠো মুশকিল ভি আছে।"

"কী মুশকিল ?"

মাথা নেড়ে বাবুলাল বললে, "সে কাউকে বলতে পারব না।"

"কেন ?"

"না।"

রাসমণির জেদ চড়ে গেল। বললে, বলতেই হবে।"

অনেক কথা-কাটাকাটির পরে বাবুলালকে বলতে হল, একটা লেড়কীকে সে ভালবেসে ফেলেছে। তাকে ছেড়ে যেতে তার মন চায় না।

রাসমণি খুব উৎসাহিত হয়ে উঠল, "আমাদের দেশের মেয়ে ?"

"হাঁ। বাঙালী।"

"তা তাকেই শাদি করে ফেল না?"

"হামি তো রাজী। লেকেন দুবার শাদি তাদের হয় না।"

এক মুহূর্ত কথায় মানে বোঝবার জন্যে রাসমণির চোখ দুটো স্থির হয়ে রইল। তক্ষুনি সে-দুটো খঞ্জনের মত নেচে উঠল যেন।

দুম করে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে বলে উঠল, "ধ্যেৎ!"

সেদিন একাদশী।

গ্রীষ্মের মধ্যাহ্নে তৃষ্ণায় রাসমণির ছাতি ফেটে যাচ্ছিল। অথচ একটু জল খাওয়ার উপায় নেই। ক্ষুধায়-তৃষ্ণায় অবসন্ন হয়ে সে বাইরের দিকের চাতালের সংলগ্ন ঘরে চোখ বন্ধ করে পড়ে ছিল। ইচ্ছা একটু ঘুমোয়। কিন্তু তৃষ্ণা বুকে নিয়ে ঘুমও আসে না।

ঠং-ঠং-ঠং-ঠং।

কিন্তু রাসমণি উঠতে পারলে না। মনে করলে, স্যাকরা-পাড়ার গলি পার হয়ে যখন বাবুলাল আসবে, তখন হয়ত সে উঠতে পারবে। কিন্তু ওর দরজার সামনে ঘণ্টা যখন খুব জোরে জোরে বাজতে লাগল, তখনও উঠতে পারলে না।

বাবুলাল উদ্বিগ্নভাবে থামলে। দীর্ঘকালের মধ্যে এ রকমটি একদিনও ঘটে নি। রাসমণিদের সদর-দরজার গোড়ায় আসতেই ঈষদুন্মুক্ত দুয়ারের ফাঁক দিয়ে তার কৌতুক-পূর্ণ একটি চোখ বরাবর দেখা গেছে।

আবার একবার ঘণ্টাটা বাজাতে লাগল।

ছেলের দল অনেক এল। অনেকেই কিছু না কিছু কিনলে। কিন্তু যাকে সে খুঁজছে তার দেখা নেই!

একটু পরে হাঁপাতে হাঁপাতে শিবু এল। আম পাড়তে বাগানে গিয়েছিল সে। তাকে দেখে বাবুলাল একটু সুস্থ হল। ছেলেদের ভিড় কমতে বাবুলাল তার হাতে একটি গোলাপ-ছড়ি দিলে। প্রীত মনে শিবু সেটি লেহন করতে শুরু করলে।

বাবুলাল জিজ্ঞাসা করলে "তোমার দিদি কই, জল দিতে এল না?"

"দিদির একাদশী যে!" শিবু বললে, "ওই ঘরে শুয়ে আছে। আমি তোমায় জল এনে দিই দাঁড়াও।"

বাবুলাল নিষেধ করলে। তার জলের দরকার নেই।

শিবুও গোলাপ-ছড়ি পেয়ে গেছে সুতরাং বাগানের দিকে ছুটল।

বাবুলাল অন্য দিনের মত তার পসরা চাতালে রেখে গামছাটাকে উপাধান করে শুয়ে পড়ল। একবার কাশলেও। ভিতর থেকে কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

চিন্তিতভাবে বাবুলাল এদিক-ওদিক চাইছে, এমন সময় ভিতরে কাশির শব্দ পাওয়া গেল। এটা তার কাশির উত্তর কি না, ঠিক করবার জন্যে বাবুলাল আবার একবার কাশলে। সঙ্গে সঙ্গে ভিতরেও কাশির শব্দ হল।

বাবুলাল উঠল। ধীরে ধীরে দরজাটা ঠেললে। ভিতরে একখানা অনাবৃত তক্তাপোশে রাসমণি শুয়ে।

বাবুলাল ধীরে ধীরে ওর কাঁধের উপর একখানা হাত রাখলে। একবার চোখ মেলে চেয়েই রাসমণি আবার চোখ বন্ধ করলে।

"খুব কষ্ট হচ্ছে ?" বাবুলাল জিজ্ঞাসা করলে।

রাসমণি ঘাড় নেড়ে জানালে, "হুঁ।"

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বাবুলাল বললে "চল, আমরা চলে যাই।"

"তোমার দেশে ?"

"না। সেখানে জায়গা হবে না।"

"তবে ?"

অন্য কোথাও। কলকত্তা ভারী শহর হয়েছে। সেখানে যেতে পারি। যাবে ?"

রাসমণি সাড়া দিলে না।

"এমন তকলিফ করে, জানকে তকলিফ দিয়ে লাভ কি ? সেখানে আমরা কত আনন্দে দিন কাটাতে পারি। যাবে ?"

"অতদূর কী করে যাব ?"

আনন্দে বাবুলালের রৌদ্রদগ্ধ মুখখানি উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। বললে, "তুমি রাজি হলে গঙ্গাজীতে একখানা নৌকো ঠিক করি। শুধু গঙ্গাজী পর্যন্ত পায়দল যেতে হবে। পারবে না ?"

রাসমণি আবার দ্বিধাভরে চুপ করে রইল।

বাবুলাল উৎসাহের সঙ্গে ভাবী জীবনের একটা রৌদ্রোজ্জ্বল ছবি আঁকতে লাগল। গঙ্গাজীর ধারে ছোট একখানা ঘর বানাবে তারা। সেখানে কত লোক, কত কেনাবেচা। মানুষ দুদিনে লাল হয়ে যাচ্ছে। চাই কি, ওরাও একদিন বেশ দু'পয়সা কামাই করতে পারবে। তা যদি না-ও পারে, সকাল-সন্ধ্যা গঙ্গাজীমে আস্নান এবং আনন্দ তো করতে পারে। যাবে ?

রাসমণি চোখ বন্ধ করে যেন জীবনকে দেখতে লাগল। কলকাতা শহর, গঙ্গা, তাদের ছোট্ট মাটির ঘর, উঠানের নারিকেল গাছ, সন্ধ্যার পরে ফেরি করে যখন বাবুলাল ফিরে আসবে, তখন সেইখানে বসে কত হাসি-গল্প। সব যেন সে দেখতে লাগল। দেখতে দেখতে তার সমস্ত শরীর যেন অবশ হয়ে এল, কিন্তু রক্তে যেন আগুন জ্বলতে লাগল।

বাবুলাল সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলে, "যাবে?"

"কবে?"

"নৌকো ঠিক করতে যতদিন লাগে। চার-ছ দিন।"

রাসমণি বললে, "যাব।"

বাস্তব জীবনে এই স্বপ্নের কিছু মিলেছে, কিছু মেলে নি।

কলকাতা ভারী শহর তাতে আর সন্দেহ নেই। সিপাই যুদ্ধ মিটে গেছে। ইংরেজ তার নতুন সাম্রাজ্যের রাজধানীকে সাজাতে ব্যস্ত। গঙ্গাও প্রকাণ্ড বড় গঙ্গা। রাসমণিদের দেশের গঙ্গার চেয়ে অনেক বড়। তার বুকে কত সওদাগরী জাহাজ, পণ্যবাহী নৌকা! আর দিনরাত্রি কী হট্টগোল!

একখানা বেড়ার ঘর গোড়ার দিকে পেয়ে ছিল বটে, উঠানের নারিকেল গাছটি সমেত। তার আড়ালে যখন বড় করে চাঁদ উঠেছে, তখন কিন্তু স্যাঁত-সেঁতে দাওয়ায় বসে দুজনে গল্প করে নি। অথবা করেছে, পাশাপাশি বসে, কিন্তু নিঃশব্দে। অজস্র স্বপ্ন-মদির গল্প একজনের হৃদয় থেকে অন্যজনের হৃদয়ে অদৃশ্য পথে সঞ্চারিত হয়েছে। এর চেয়ে সুখের দিন ওদের জীবনে আসে নি।

বছর খানেক পরেই এখান থেকে ওদের উঠতে হল। কী একটা কোম্পানী সমস্ত স্থানটা জুড়ে প্রকাণ্ড একটা ইটখোলা বসালে।

ওরা উঠে এল একটা বস্তিতে। লম্বা টানা বস্তি। পরের পর অনেকগুলো ঘর। প্রত্যেক ঘরে এক একটা পরিবার। সামনের লম্বা দাওয়ায় সারি-সারি পঁচিশ-ত্রিশটা উনান সকাল-সন্ধ্যায় বস্তিটাকে ধোঁয়ায় অন্ধকার করে তোলে। আর সামনের উঠোনে রাজ্যের জঞ্জাল। তার সামনে একটা বেড়ার পরেই কোমর-পর্যন্ত গভীর খোলা নর্দমা দিনরাত্রি দুর্গন্ধ উদ্গীরণ করছে।

বছর চারেক এখানে ওদের থাকতে হয়েছে।

রাসমণির সব চেয়ে খারাপ লেগেছে—একটা অন্তরালহীন অনাবৃত জীবন। এখানেই ওদের প্রথম ছেলেটি জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু নিরিবিলি

বসে এখানে কোন দিন ওরা দুজনে হাসি-গল্প করেছে বলে মনে পড়ে না। দুজনে প্রতিদিন ছকে-বাঁধা নিজের নিজের কাজ করেছে, আর পশুর মত জীবন যাপন করেছে।

কিন্তু এইখানেই ওদের সৌভাগ্যের সূত্রপাত।

প্রথম এসে বাবুলাল মাথায় করে তার গোলাপ-ছড়ি ফেরি করত। তারপরে ফুটপাথে বসে তেলে-ভাজা বিক্রি করতে লাগল। কিন্তু তাতে খুব সুবিধা না হওয়ায় আবার পথে-পথে ফেরি করা আরম্ভ করলে, গোলাপ-ছড়ি নয়, কাপড়-জামা। তখন বিলিতী কাপড় আমদানী হতে আরম্ভ হয়েছে।

এই অবস্থায় হঠাৎ একটা দুঃসাহসী কাজ করে তার অবস্থা একেবারে ফিরে গেল। গঙ্গার ধারে বেড়াতে বেড়াতে একটা সুপুরির নৌকা ধরে ফেললে।

তখন তার অবস্থা কিছুটা সচ্ছল হলেও সুপুরির নৌকা ধরবার মত হয় ন। কী সাহসে যে সে ধরে ফেললে তাও ভাবতে বিস্ময় লাগে ওর নিজেরই। কে যেন ওকে সেইখানে টেনে নিয়ে গেল। কে যেন ওকে দর-কষাকষি করালে। তার সংবিৎ ফিরে এল যখন দর পাকা হল।

যখন সে ভাবছে, টাকাটা কী ভাবে সংগ্রহ করা যায়, তখন একজন দালাল হাঁপাতে হাঁপাতে এসে তার দরের চেয়ে অনেক বেশী দর দিয়ে নৌকাগুলো কিনে নিলে। বাবুলালকে কিছুই করতে হল না। ফাঁকতালে মোটা টাকা পেয়ে গেল। এই থেকে তার সৌভাগ্যের সূত্রপাত।

বাবুলাল সঙ্গে সঙ্গে বড় রাস্তার উপরে কাঠা-দশেক জায়গা কিনে ফেলল। সামনের সদর দরজার দুপাশে দু প্রস্থ চালাঘর তৈরি করলে। একটাতে তার নিজের কাপড়ের দোকান। অন্যটি ভাড়া দিলে। ভিতরে আর একটা মাটির ঘর তৈরি করলে নিজেদের থাকবার জন্যে।

রাসমণি বস্তি থেকে এখানে উঠে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলে।

তাকে কিন্তু তখন আর কেশব চাটুজ্যের বিধবা কন্যা বলে চেনবার উপায় নেই। দুই বাহুতে ও বুকে উল্‌কি। হাতে-কানে-গলায় হিন্দুস্থানী গহনা। কথার মধ্যেও হিন্দুস্থানী টান এসেছে।

কিন্তু বাবুলালের তখন জোর-পড়তা আরম্ভ হয়েছে। যেদিকে হাত বাড়ায় সেদিক থেকেই মুঠো মুঠো টাকা আসে। বছর দশেকের মধ্যে মাটির বাড়ি, চালা-ঘর বিরাট অট্টালিকায় রূপান্তরিত হয়ে গেল। ফটকে তকমা-পরা দারোয়ান। জুড়িগাড়িতে ছেলেরা কলেজে যায়, রাসমণি গড়ের মাঠে হাওয়া

থায়। আর বাবু বাবুলাল রায় কোঁচানো ধুতি-পাঞ্জাবি পরে চমৎকার বাঙালী হিন্দুসমাজে মিশে গেল। প্রতি সন্ধ্যায় তার বাড়িতে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের পায়ের ধুলো পড়ে। বাড়িতে দোল-দুর্গোৎসব আরম্ভ হয়ে গেল।

আরও কয়েক বৎসর পরে।

সদরের দেউড়িতে পেটা-ঘড়িতে ঢং-ঢং করে আটটা বাজল। বাবুলাল অন্দরে এলেন। এ-সময় অন্দরে তিনি বড় একটা আসেন না।

চাকর এসে সুগন্ধী পান-তামাক দিয়ে গেল। খোপায় বেলফুলের মালা জড়িয়ে ব্যস্তভাবে রাসমণি দেবী এলেন।

"কী ব্যাপার! এত সকালে এলে যে! শরীর ভাল আছে তো?"

বাবুলাল ওর ভয় দেখে হাসলেন। "অন্যায় হয়ে গেছে। শাস্তি দাও।"

রাসমণিও হেসে ফেললেন। "অসময়ে এসেছ, তাই ভয় পেয়ে গিয়েছিলুম।"

"অসময়ে কি আসি না? আমি কি শুধুই সুসময়ে আসি? এ-অপবাদ কী করে দিলে?"

রাসমণি হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বললে, "সে-অপবাদ তোমাকে দিলে অধর্ম হবে। অসময়ে একমাত্র তুমিই এসেছিলে। এসেছিলে বলেই আজ সুসময়ের দেখা পেলুম।"

বাবুলাল হেসে বললে, "সেই পুরনো কথা মনে পড়ল?"

"হ্যাঁ।"

হঠাৎ বাবুলাল সোজা হয়ে উঠে বসলেন।

"তোমার বাপ-মায়ের খবর রাখ রাসু?"

"না। কী করে রাখব? তুমি জান কিছু?"

"জানি। তোমাকে বলি নি। দুঃখ পাবে বলে ইচ্ছে করেই বলি নি। অল্প দিন হল তাঁরা মারা গেছেন। মধ্যে বড় কষ্ট পেয়েছেন।"

এ-সংবাদে রাসমণির মনটা খুব ভারী হয়ে উঠল। জিজ্ঞাসা করলে "কেন?"

"তুমি চলে আসার পরে সমাজ ওঁদের একঘরে করেছিল। অনেক উৎপাতও করেছে। এক সময় তোমার বাবা ওদের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে মুসলমান হতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাও পারেন নি।"

"তারপরে?"

"তারপরে ওরা গ্রাম ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। অন্ধকার থাকতেই ওরা বের হয়েছিলেন। কিন্তু গ্রামের লোকে কী করে টের পায়। তারা টিন বাজাতে-

বাজাতে অনেক দূর পর্যন্ত ওঁদের পিছু পিছু আসে। ধুলো-কাদা ছোঁড়ে।"

"তুমি কী করে খবর পেলে?"

"শিবুর কাছে।"

"শিবু! আমার ভাই শিবু!"

"হ্যাঁ।"

"তার সঙ্গে কোথায় দেখা হল?"

"এইখানেই। রোজই দেখা হত। মাস দুয়েক আর হচ্ছে না।"

"কেন?"

"সে এখানে নেই। আমার কানপুরের মিলের ম্যানেজার হয়ে চলে গেছে।"

রাসমণি লাফিয়ে উঠল, আমাদের শিবু! আমাদের কানপুরের মিলের ম্যানেজার হয়ে গেছে?"

"হ্যাঁ।"

কী বলছেন বাবুলাল পাগলের মত! রাসমণি অবাক হয়ে ওঁর দিকে চেয়ে। বাবুলাল সমস্ত ব্যাপার বললেন:

অনেক দিন আগে একটি ভিখারী তাঁর গদিতে তাঁর কাছে ভিক্ষার জন্যে হাত পাতে। তার চেহারার অনেক পরিবর্তন হলেও বাবুলালের কেমন মনে হয় ছেলেটি শিবু নয় তো? মুখে পাতলা গোঁফ-দাড়ি। চুল উস্কোখুস্কো। মলিন ছেঁড়া কাপড়। কিন্তু বাঁ চোখের তারায় সেই সাদা দাগটি অবিকল আছে।

বাবুলাল জিজ্ঞাসা করলেন, "খাবে কিছু?"

"না।"

"না কেন? তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে, সমস্ত দিন খাওয়া হয় নি।"

ছোকরা কেঁদে ফেললে, "ওই গাছতলায় আমার বাবা-মা বসে আছেন আমার জন্যে। ভিক্ষে করে যা পাই নিয়ে গিয়ে ওঁদের খাওয়াব, তারপরে আমি খাব।"

কথাবার্তা ভদ্রসন্তানের মত। এবং চোখের তারায় সেই সাদা দাগ!

বাবুলাল বললেন, "ওঁদের ব্যবস্থাও আমি করছি। তুমি ভেব না।"

বলে একজন কর্মচারীকে বললেন, "কিছু খাবার নিয়ে গিয়ে ওঁদের দু'জনকে খাইয়ে এস। আর একজন এর জন্যে কিছু খাবার নিয়ে এস।"

খেয়ে-দেয়ে ছেলেটি সুস্থ হলে বাবুলাল জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার নাম কি ?"

"আজ্ঞে, শিবনাথ চট্টোপাধ্যায়।"

বাবুলাল চমকে উঠলেন। নামটা মিলছে।

জিজ্ঞাসা করলে, "বাড়ি কোথায় ?"

শিবনাথ জেলার নাম করলে। আরও প্রশ্নে গ্রামের নাম। সব মিলে গেল।

বাবুলাল জিজ্ঞাসা করলেন, "গ্রামে কি তোমাদের চলছিল না ?"

শিবু স্নেহের স্পর্শ পেয়ে অকপটে সমস্ত বিবৃত করলে। বাবুলাল তখনই তাঁর দোকানে ওকে চাকরি দিলেন। ওর বাপ-মায়ের থাকবার ব্যবস্থা করে দিলেন। বাংলা মোটামুটি শিবু জানত। ওর ইংরিজী লেখাপড়া শেখার ব্যবস্থা করে দিলেন। কাজে-কর্মেও ক্রমশ নিজের অধ্যবসায় এবং সততার জোরে উন্নতি করতে লাগল। বাবুলালের শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তারও শ্রীবৃদ্ধি হল।

রাসমণি জিজ্ঞাসা করলে, "ও কি তোমাকে চিনতে পেরেছে ?"

"না।"

"তুমিও পরিচয় দাও নি ?"

"না। সেটা ঠিক হতো না।"

রাসমণিও সেটা বুঝলে। চুপ করে রইল।

হঠাৎ এক সময় জিজ্ঞাসা করলে, "আচ্ছা, সেই যে তোমার দোকানের একটি কর্মচারীর খুব ধুমধাম করে ইংরিজী বাজনা বাজিয়ে বিয়ে দিলে, সে কি আমাদের শিবুর ?"

"হ্যাঁ। সমাজ ওদের টিন বাজিয়ে তাড়িয়েছিল, আমি তার শোধ নিলাম। আর একবার নেব, তোমার বড় ছেলের বিয়ের সময়।"

বাবুলাল লহরে লহরে হাসতে লাগলেন।

॥ নবীন মেঘের ছন্দ ॥

ঘুঁটেওয়ালার সঙ্গে আধঘণ্টা দর কষাকষি করে সারদাসুন্দরী সস্তায় কিছু ঘুঁটে সওদা করেছে। কিন্তু লোকটা গনতিতে কিছু মেরেছে কি না, সে বিষয়ে তার মনে সন্দেহ রয়ে গেছে।

সেই কথা গজগজ করতে-করতে সে উপরে উঠছিল, এমনি-সময় নাপতিনী এল।

বেলা চারটে বাজে। কিন্তু সারদাসুন্দরীর মনে হচ্ছিল দুটো। এই তো একটু আগে তার সঙ্গে ঝগড়া করতে-করতে নাকে-মুখে দুটো গুঁজে কর্তা গেলেন ছাতিবগলে আফিসে। তারপরে ছেলেরা গেল স্কুলে। বাবা, কী জ্বালাতনটা তারা করে! কোনদিন যদি শান্তভাবে তারা খেয়ে স্কুলে যায়! একটা-না-একটা হাঙ্গামা আছেই!

সকাল থেকে ঝি আসে নি। ঝি তো নয়, যেন রাজকন্যে! কথায় কথায় ফোঁস করেই আছে।

সুতরাং দুটো খেয়ে নিয়ে বাসন-কোসন মেজে, রান্নাঘর ধুয়ে, কাজকর্ম সেরে এই তো সে উঠল?

উঠে একটু গা গড়াবে বলে মেঝেয় মাতুরখানা সবে সে পাতছিল। এমন সময়—ঘুঁটে!

এই ঘুঁটে তো সেই ঘুঁটে!

—জানলে নাপিত-বউ, আধঘণ্টা কচলা-কচলি করে তবে দিলে ঘুঁটে। আর কী ঘুঁটে! বাতাসার মত ছোট।

—ওই রকমই হয়েছে বৌদি। ঘুঁটেয় আর হাত দেবার উপায় নেই।

—কোন্ জিনিসটা সস্তা বল? তরিতরকারি, মাছ, কোন জিনিস কেনবার উপায় আছে? চারটে টাকা নিয়ে কর্তা বাজারে গেলেন, দুআনা ঘুরিয়ে আনলেন। এবেলায় কোন রকমে হল, ওবেলায় আবার কিছু বাজার করতে হবে।

—তাই বটে! ছাদে বসবেন বউদি, না বারন্দায়?

বারন্দার সামনে একটুখানি খোলাছাদ। বসবার পিঁড়িটা হাতে নিয়ে সারদাসুন্দরী বললে, ছাদেই চল বউ, বারান্দাটা কেমন অন্ধকার ঠেকছে।

ঠেকবারই কথা। পশ্চিম-আকাশে আকুল করে মেঘ উঠেছে। খোলা ছাদে পা দিয়ে সেই নিবিড় কালো মেঘের দিকে চেয়ে সারদাসুন্দরী থমকে দাঁড়িয়ে গেল!

—দেখ, দেখ, কী সুন্দর মেঘ করেছে দেখ!

দেখবার মতই শোভা! দত্তবাড়ির কৃষ্ণচূড়া গাছটিকে ঘিরে নবীন বর্ষার মেঘ যেন ময়ূরের মত পেখম তুলেছে। তারই ছায়া ঘনিয়েছে কৃষ্ণচূড়ার পাতায়-পাতায়। ওদিকে কাদের একটা বাড়ির ছাদে ধবধবে সাদা একখানা কাপড়ের প্রান্ত কৃষ্ণচূড়া গাছের ফাঁক দিয়ে উড়তে দেখা যাচ্ছে।

সারদাসুন্দরী থমকে দাঁড়াল।

পায়ে আলতা পরাতে-পরাতে নাপিত-বউ অনর্গল বকতে লাগল:

মুখুজ্জেদের ছোট বউয়ের কথা। কী তার ঠ্যাকার! সদরালার মেয়ে বলে মাটিতে পা যেন আর পড়ে না। ছেলের ভাতে লোক তো খাওয়ালে কত, তাতেই যেন ঠেকরে-ঠেকরে বেড়াচ্ছে! হ্যাঁ, মেয়ে বলতে হয় তো ঘোষালদের বড় মেয়েকে। কী ঠাণ্ডা মেয়ে, আর কী সুন্দর ছেলেটি হয়েছে—যেন মোমের পুতুল!

মুখুজ্জেদের ছোট-বউয়ের সম্বন্ধে সারদাসুন্দরী নাপিত-বউয়ের সঙ্গে একমত। তবে ঘোষালদের বড় মেয়ে যত ভালোই হোক, নাপিত-বউ যতখানি বলছে, ততখানি সত্য কি না সে বিষয়ে সারদাসুন্দরীর সংশয় আছে।

ঠাণ্ডা মেয়ে হতে পারে, কিন্তু পেটে-পেটে কত কি আছে বাইরে থেকে দু-একদিন দেখে কেউ বলতে পারে? আর মোমের পুতুল। হায়রে মোমের পুতুল! পাশের বাড়ির টগু যখন হল, লোকে বলত, এমন সুন্দর ছেলে সাহেবদের ঘরেও হয় না। আর আজ? ওই তো টগু রাস্তায় রাস্তায় গুলি খেলে-খেলে বেড়াচ্ছে। কে বলবে, ভদ্রলোকের ছেলে!

তবে হ্যাঁ, বলতে পার, যখন বড় হবে, নিজের শরীরের যত্ন নিতে শিখবে, তখন যদি ভালো টাকা-পয়সা রোজগার করতে পারে, তা হলে আবার টগুর ফুটফুটে বাবু-বাবু চেহারা হতেও পারে।

কিন্তু মধ্যবিত্ত বাঙালী-ঘরে কে আর তেমন আশা করতে পারে!

সারদাসুন্দরীর নিজের ছেলে-মেয়েগুলি কালো। ফরসা ছেলের উপর, বিশেষ করে সে যদি প্রতিবেশীর সন্তান হয়—তার চিত্ত বরাবরই বিমুখ।

অন্যদিন হলে নাপিত-বউয়ের কথায় নিশ্চয়ই সে প্রতিবাদ করত। কিন্তু

আজকে তার স্বভাবধর্মকে উপেক্ষা করেই তার মন যেন এলোমেলো ছুটে বেড়াচ্ছে। কোন ছোট কাজে, কোন তুচ্ছ কথায় বসতে চাইছে না।

নাপিত-বউ অনর্গল বকে গেল। সারদাসুন্দরী কতক শুনলে, কতক বা শুনলে না। কখনও সংক্ষেপে সাড়া দিলে, কখনও সাড়া দিলে না।

বেশ চওড়া করে আলতা পরিয়ে দিয়ে নাপিত-বউ হেসে বললে, কত মেয়ের পায়ে আলতা পরাই বউদি, কিন্তু আপনার মত এমন চমৎকার পায়ের গড়ন একজনেরও নেই।

এই কথাটি নাপিত-বউ প্রায়ই বলে—যখনই নিজের জন্যে সারদাসুন্দরীর একখানি প্রসাদী-শাড়ি অথবা ছেলের জন্যে একটা জামার দরকার হয়। হয়তো সবাইকেই বলে। সারদাসুন্দরী এর কোন মূল্য দেয় না। কে জানে, বিশ্বাসই করে কি না।

কিন্তু সারদাসুন্দরী এই স্তুতিবাণী একেবারে উড়িয়ে দিতে পারলে না। নিজেই একবার আড়চোখে নিজের সন্তপরিষ্কৃত আলতারাঙা পা-দুটির দিকে চাইলে।

মন্দ নয়! বরং ভালোই বলা চলে। রং তার ফরসা, এখন বয়েসের ছায়া নেমে মলিন দেখায়। কিন্তু মেজে-ঘষে নাপিত-বউ পা-দুটিকে ঝকঝকে করে তুলেছে।

মেয়েটা আলতা পরায় ভালো।

বললে, একটু দাঁড়াও নাপিত-বউ। তোমার ছেলের জন্যে একটা জামা দেব নিয়ে যাও। একরকম নতুনই আছে। ছেলেটা পরেও নি বেশি দিন। ছোট হয়ে গেছে। ভাবলাম তুলে রেখে কি হবে? তোমার ছেলেটির গায়ে হবে বোধ হয়! দেখ দিকি।

ছেলেটির গায়ে হবে, হয়তো একটু বড়ই হবে। তা হোক, দু-দিন বেশি করে গায়ে দিতে পারবে!

নাপিত-বউ খুশি হয়ে চলে গেল।

পা-দুখানি তার সত্যই ভালো।

সারদাসুন্দরীর মনে পড়ল বহুদিন আগের কথা। তখনও বোধ হয় তার ছেলেপুলে হয় নি, কি বড়টি মাত্র হয়েছে।

সেদিন বোধকরি শনিবার ছিল। পশ্চিমের জানলাটা খুলে ভিজে এলো-চুল পিঠের উপর ছড়িয়ে খাটে বসে সারদা একখানা নভেল পড়ছিল। পা-ঝুলিয়ে

বসে ছিল সে। নভেলের উপসংহার তখন ঘনিয়ে এসেছে। নায়িকার সঙ্গে নায়কের মিলনের আর বেশি বাকি নেই। উত্তেজনায়, আনন্দে পা-দুখানি তার ঘন ঘন দুলছিল। হঠাৎ···

—বাঃ!

সারদা চমকে উঠেই ফিক করে হেসে মাথায় কাপড়টা টেনে দিলে। স্বামী যে কখন এসে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়েছে, গল্পের ঝোঁকে তার খেয়ালই ছিল না।

তারিণীচরণের বয়স তখন ছাব্বিশ-সাতাশ। মাথায় সুবিন্যস্ত কোঁকড়া চুলের তরঙ্গ। চোখে নেশা, ঠোঁটে হাসি।

বলেছিল, কী সুন্দর পা-দুখানি তোমার! যেন পদ্মফুলের মত। মনে হচ্ছে···

তারিণী গানের সুরে বলেছিল:

'স্মরগরলখণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং

দেহি পদপল্লবমুদারম্।'

পুলকিত লজ্জায় সারদার কর্ণমূল পর্যন্ত লাল হয়ে উঠেছিল।

তাড়াতাড়ি বলেছিল, আঃ! চুপ কর। কেউ শুনতে পাবে যে!

সেই বয়সে সারদার তখন কত ভয়, কত সংকোচ, কত লজ্জা!

আজ আকাশ জুড়ে মেঘ করে এসেছে। ছেলেরা গেছে স্কুলে। ঝি-টি পর্যন্ত নেই। বাড়ি জনশূন্য। প্রথম যৌবনের লজ্জা-সংকোচ-ভয়ও আজ নেই। আজ যদি তারিণী আগের মত তেমনি করে আসত।

বাইরের বারন্দার এককোণে একখানা ইজি চেয়ার পাতা। বহু কালের পুরনো চেয়ার, বহুকাল থেকে ওইখানে পাতা আছে। এখন আর সারদা ওদিক দিয়ে যায়ই না। তারিণী আফিস থেকে এসে একাই অনেকরাত্রি পর্যন্ত ওইখানে বসে-বসে তামাক টানে আর ঝিমোয়, ঝিমোয় আর তামাক টানে

অথচ একদিন ছিল, তারিণী তখন তামাক খেত না, সিগারেট খেত। বোসেদের বাড়ির কৃষ্ণচূড়ার ফাঁকে প্রথম-বর্ষার ঝাপসা চাঁদ উঠত। তারই আলোর আভাস সিগারেটের ধোঁয়ায় একটা অপূর্ব রহস্যলোকের সৃষ্টি করত।

তারিণী বসে থাকত চেয়ারে, সারদা চেয়ারের হাতলের উপর। কত-রাত্রি পর্যন্ত! নিঃশব্দে! দুজনের দেহ পরস্পরকে ছুঁতো, কি ছুঁতো না।

সেইদিন হঠাৎ কবে সরে গেল, ওরা জানতেও পারে নি, টেরও পায় নি।

টের পেয়েছে শুধু সারদা এবং এতকাল পরে আজ!

বেলা এখনও অনেক আছে। ছেলেদের স্কুল থেকে ফিরতে অনেক দেরি। তারও অনেক পরে আসে তারিণী। হাতে কাজ কিছু নেই। প্রতিদিনের কাজে তার মনও বসছে না আজ। সেই নিত্য রাঁধার পরে খাওয়া, আর খাওয়ার পর রাঁধা।

বারন্দার ঈজি চেয়ারটির হাতলের উপর বসে সে ভাবতে লাগল। অতিক্রান্ত বিবাহিত জীবনের দিনগুলি ছায়াছবির মত একটি একটি করে তার চোখের সামনে ভেসে আসে। এক অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আর এক অন্ধকারে মিলিয়ে যায়।

এক পশলা বৃষ্টি এক্ষুনি হয়ে গেল। কিন্তু সমস্ত আকাশ এখনও মেঘে ভারাক্রান্ত।

থেকে-থেকে হাওয়ার ঝাপটা আসে। গাছের পাতা থেকে টপ-টপ করে ঝরে পড়ে মোটা মোটা জলের ফোঁটা। স্বপ্নাবিষ্ট চোখে সারদা দেখে। কিন্তু কি কথা তার মনে জাগে তার মনও জানে না। অজ্ঞাতে একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস তার বুকের গভীর অন্তস্তল থেকে বেরিয়ে আসে।

হুড়মুড় করে ছেলেরা বাড়ি ঢুকতে তার সংবিৎ ফিরে এল। তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে উঠল সে।

তার মন আজ স্নেহে আবিষ্ট হয়ে আছে, এই বর্ষার মেঘের মত।

তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে উঠল সে। ছেলেদের খাবার তৈরি করাই ছিল। সারদা গিয়ে তাদের খেতে দিলে। খেয়ে তারা খেলতে চলে গেল

তারপরে উনান ধরাবার পালা।

আকাশের দিকে একবার চেয়ে দেখলে সে। এখনও তেমনি ভারাক্রান্ত। সমস্ত রাত্রিই আজ বোধহয় এমনি যাবে: এমনি ধোঁয়াটে মেঘ এবং থেকে-থেকে বৃষ্টি।

নতুনবাজারে বেলফুলের মালা এখনও কি বিক্রি হয়? উগ্রগন্ধী কেয়াফুল?

কলঘর থেকে স্নান সেরে সারদা উপরে গেল কাপড় ছাড়তে। আলনায় যে ক-খানি শাড়ি ঝুলছে, তার একখানিও তার পছন্দ হল না। বাক্স থেকে ভাঙল একখানা ধোয়ানো ধনেখালি শাড়ি।

কিন্তু প্রসাধনের কিছুই তো তার নেই। কোথায় উড়ে গেছে স্নো-ক্রীমের শিশিগুলো। শখ করে কবে যেন কিনেছিল একটা রূপোর পাউডার-কেস। ভাঙা আলমারিতে তারই অনাদৃত ম্লানমূর্তি চোখে পড়ে।

আয়নায় নিজের মুখখানি সারদা আর একবার দেখলে—তন্ময় হয়ে

দেখলে—এবং হয়তো অনেকক্ষণ ধরেই দেখত—ইতিমধ্যে থুপথুপে পায়ের শব্দে চমকে সে বাইরে এল।

তারিণী। ক্লান্ত-দেহে ফিরছে আফিস থেকে।

—ভিজে গেলে নাকি?

—সামান্য।

তারিণী ছাতাটা এক কোণে মেলে রাখলে।

—কণ্ট্রোলের কি চমৎকার ছাতাই হয়েছে! কালো রং গলে গলে পড়ছে। পিঠটা একবার দেখ!

—সর্বনাশ! পাঞ্জাবির পিঠের দিকটা যে একেবারে গেছে!

—হুঁ!

বলেই তারিণী থমকে গেল।

সারদার দিকে চেয়ে দেখবার এতক্ষণ তারিণী সময়ই পায় নি। এখন চেয়েই চমকে গেল :

তুমি কি কোথাও যাচ্ছ নাকি?

—হ্যাঁ!—সারদা সলজ্জভাবে হাসলে।

—এই বর্ষায়? কোথায়?

—সিনেমায়।—সারদা তেমনি সলজ্জ-হাস্যে বললে—তোমারসুদ্ধ টিকিট কেনা হয়েছে। যাবে না?

পরিহাস। সারদাকে নিয়ে তারিণী সিনেমায় যাবে, এটা সে পরিহাস ছাড়া আর কিছু বলে ভাবতেই পারে না। তারিণী নিশ্চিন্তে ভিজা জামা-কাপড় ছেড়ে তামাক সাজতে বসল।

এই তার বরাবরের অভ্যাস। আফিস থেকে এসে তামাকটি সেজে টিকে ধরিয়ে হাত-মুখ ধুতে যায়। তারপর চা-খাবার খেয়ে একটি পান মুখে দিয়ে ঈজি চেয়ারে বসে। টিকে ততক্ষণে ধরে যায়। তারিণী চোখ বন্ধ করে আরামে তামাক টানে।

সারদা বলে, আমি তামাক সাজছি। তুমি হাত-মুখ ধুয়ে এস।

এও কি পরিহাস? কিন্তু প্রশ্নটা তারিণীর মনে উঠল না। আগে, অনেক আগে, তারিণীর অনেক কাজই সারদা করে দিত। তারপরে যে একটা সুবৃহৎ কাল গেছে, এটা তারিণী অন্তত সেই মুহূর্তে বিস্মৃত হয়ে গেল।

তারিণী হাত-মুখ ধুয়ে এসে বসতেই সারদা চা-জলখাবার নিয়ে এল। পানটি মুখে দিয়ে সে গড়গড়ার নলটি টেনে নিলে।

চেয়ারে হাতলের উপর বসে সারদা জিজ্ঞাসা করলে, চমৎকার বর্ষা! না?

তারিণী হেসে বললে, বাড়িতে বসে থাকলে চমৎকার। কিন্তু যাদের বাইরে বেরুতে হয়, তাদের বিশ্রী লাগে।

নীচে ছেলেদের পায়ের শব্দ পাওয়া গেল।

চেয়ারের হাতলের উপর থেকে তাড়াতাড়ি উঠে সারদা দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল।

মেঘ আবার কালো হয়ে আসছে। গাছের পাতায়-পাতায় দোলা লেগেছে। এখনি আবার বৃষ্টি নামবে।

বেলফুলের মালা, উগ্রগন্ধী কেয়াফুল, কোন কথাই সারদা তুলতে পারলে না। একদিন যে-প্রসঙ্গ ছিল সহজ এবং স্বাভাবিক, কালের ব্যবধানে তাই আজ সঙ্কোচে কণ্টকিত হয়ে উঠেছে! বিস্মৃতির অন্ধকার থেকে সেই প্রসঙ্গ নতুন করে তুলতে বাধে।

সারদা জিজ্ঞাসা করলে, আজ কি রান্না হবে বল তো?

তারিণী চমকে উঠলো: কেন? তরকারি নেই? সকালে দু-টাকার বাজার করলাম···ওই তো তোমার দোষ! বুঝে চলতে জান না—

—না, না! সে কথা বলি নি। আজকের দিনে খিচুড়ি আর ইলিশ মাছ···

সারদা কথা শেষ করতে পারলে না। তারিণী বারুদের মত জ্বলে উঠল!

—তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে! ইলিশ মাছ! ইলিশ মাছের দর জান?

হিসাব-নিকাশ···বুঝে চলা···দর-দস্তুর··কোন্ লোকে আছে সারদা, যে কিছুই তার খেয়াল হচ্ছে না?

তারিণীর একটা ধমক যেন তার মনের সুইচটি টিপে দিলে আর মুহূর্তে সে ফিরে এল তার স্বভাবের মধ্যে, যে-স্বভাবের বশে সে আজ দুপুর-বেলাতেই ঘুঁটেওয়ালার সঙ্গে কচলা-কচলি করছিল।

সেও জ্বলে উঠল। ভাঙ্গা কাঁসরের মত তার গলা খনখন করে বেজে উঠল:

—একটা কথার কথা বলতেই তুমি খ্যাঁক করে ওঠ কেন বল তো? মাথা আমার খারাপ হয় নি, তোমারই হয়েছে। হিসেবে কার কত জ্ঞান, আমার জানতে বাকি নেই। এই কেষ্টা!

কেষ্ট কোথা থেকে একটা ঘুড়ি পেয়েছে। কিন্তু ছেঁড়া ঘুড়ি। সেইটে সে আটা দিয়ে জোড়া লাগাবার চেষ্টা করছিল।

সারদা তাকেই ধমক দিলে : ঘুড়ি ওড়ালেই পেট ভরবে ? পড়াশুনো করতে হবে না ? যা, পড়তে যা !

তারপর দুমদুম করে নেমে চলে গেল নিচে, রান্নাঘরে। কেয়াফুলের উগ্রগন্ধ, বেলফুলের মালা, নবীন মেঘের ছন্দ এক মুহূর্তের সুখস্বপ্নের মত হাতা-বেড়ির ঝন্‌ঝনায় কখন গেল মিলিয়ে সে টেরও পেল না।

॥ রহস্য ॥

বহুকাল পরে বাসুদেবের সঙ্গে হঠাৎ দেখা কলকাতার এক জনবহুল রাস্তায়। কুড়ি বৎসর পরে পরস্পরকে চেনা সহজ নয়। উভয়েরই মাথার চুলে পাক ধরেছে। বাসুদেবের তো মাথায় বেশ বিস্তীর্ণ একটি টাক। তথাপি কিন্তু চিনতে কষ্ট হল না বিশেষ।

কুড়ি বৎসর আগে কলেজ হস্টেলের একই ঘরে বছর দুই আমাদের কেটেছে। আমি যখন থার্ড ইয়ারে, ও তখন ফার্স্ট ইয়ারে। শ্যামবর্ণের বেঁটে-খাটো একটি ছেলে। অসাধারণ পেটুক। বাপের কাছ থেকে টাকা আসত অনেকগুলি। তার অধিকাংশই যেত খাবারওয়ালার বাক্সে। কিছু নয় তো, জলই খেয়ে ফেললে বড় ঘটির একটি ঘটি।

জিজ্ঞাসা করতাম, মানুষ তো ওইটুকু। ওগুলো রাখ কোথায়?

হেসে উত্তর দিত, ব্যবস্থা করলে রাখা যায় দাদা! সুটকেস দেখেন নি, ব্যবস্থা করলে অনেক জিনিস রাখা যায়। অব্যবস্থায় কিছু রাখা যায় না।

ওইটুকু জঠর-গহ্বরে সিঙাড়া থেকে লবঙ্গলতিকা এবং রসগোল্লা থেকে সন্দেশ যে-পরিমাণ সে আশ্রয় দিত, তাতে সকলকেই স্বীকার করতেই হত যে, ব্যবস্থা ছিল।

অনেক কাল পরে কলকাতার এক জনবহুল রাস্তায় দেখা হতেই বাসুদেব ঠিক ছেলেবেলাকার মতই জড়িয়ে ধরলে: অমলদা! কী আশ্চর্য!

হেসে বললাম, আশ্চর্যই বটে। যা দিনকাল পড়েছে, তাতে বেঁচে থাকাটাই আশ্চর্য। 'কী বল বাসু'।

—নয় তো কী! চলুন, চলুন একটা খাবারের দোকানে গিয়ে বসা যাক কতকাল পরে দেখা, অনেক গল্প করবার আছে।

খাবারের দোকান! তোমার সেই পুরনো অভ্যাস এখনও যায় নি?

বাসুদেব হো-হো করে হেসে বললে, থাকতে কি চায় দাদা, কোন রকমে রেখেছি—যেতে দিই নি। ভগবান একটা শক্তি দিয়েছেন, চর্চা না করে সে-শক্তি খোয়ানো কি ভালো হত!

—কখনই না। চল কোথায় যাবে।

—কাছের একটা দোকানে গিয়ে বাসু বললে, কী খাবেন বলুন।

—এক গ্লাস জল। আমি তোমার খাওয়া দেখবার জন্তে এলাম।

তার পরে যা হয়। বাসু ছাড়লে না। আমাকেও কিছু নিতে হল। কিন্তু বাসুর জন্তে প্লেটে খাবার সাজাতে দোকানদারও যে অবাক হল, বাসু না দেখলেও তা আমার দৃষ্টি এড়াল না।

—তারপর, কী করছ বল।

ডাক্তারি। মফস্বলের ডাক্তারি যে কী ব্যাপার, আপনার বোধ হয় ধারণা নেই। সকাল থেকে দশটা পর্যন্ত বাড়িতে বসে রোগী দেখি। তারপরে যেই পায়ের তলার মাটি তেতে আগুন হল, আকাশ রুপোর পাতের মত ঝকঝক করতে লাগল, অমনি হয় ঘোড়া, নয় সাইক্লে বেরুলাম রোগী দেখতে। ফিরতে তিনটে। এত কষ্টের পয়সা দাদা, খরচ করতে ইচ্ছে হয় না।

বাসু করুণ, অনুতপ্ত দৃষ্টিতে তার প্লেটের খাবারগুলোর দিকে চাইলে।

জিজ্ঞাসা করলাম ছেলেপুলে কী?

চামচে করে হাতের রাজভোগের একটা টুকরো মুখে পুরতে যাচ্ছিল, থমকে গেল। বললে, তা অনেকগুলি দাদা। একটি ভালো ছেলে খুঁজে দিন না। বড় মেয়েটির বিয়ে আর না দিলেই নয়।

বাসু রাজভোগটি নিঃশেষ করে বললে, আপনি তো কিছুই খেলেন না দাদা। খাওয়া আপনার বরাবরই কম।

হাঁকলে: দেখি, আর একটা রাজভোগ দাও তো হে!

বাসুদেবের একটি ছোট ভাই ছিল, শুকদেব। অত্যন্ত ডানপিটে ছেলে। মাঝে মাঝে বাড়ি থেকে পালিয়ে এসে দাদার হস্টেলে . আশ্রয় নিত। আশ্চর্য, তার কথটাই এতক্ষণ মনে পড়ে নি।

তাড়াতাড়ি বললাম, আসল লোকের খবরই নেওয়া হয় নি। তোমার সেই ভাইটির খবর কী হে—শুকদেবের?

বাসু যেন চমকে উঠল। তার মুখের উপর বেদনার গাঢ় ছায়া নেমে এল। একটু যেন সামলে নিয়ে বললে, শোনেন নি তার খবর?

—না তো!

—সে তো নেই।

—মানে?

—সে আত্মহত্যা করেছে।

—আত্মহত্যা! বল কী!

বাসু জবাব দিলে না। অনেকক্ষণ পরে বললে, চলুন পার্কে গিয়ে বসি।

পার্কে অসম্ভব ভিড়।

এক কোণে একটি গাছের তলায় ঘাসের উপর বসা গেল। কিছুক্ষণ দুজনেই চুপচাপ। তারপরে বাসু বললে, সে এক অদ্ভুত ব্যাপার দাদা। আমি বিজ্ঞানের ছাত্র। আমার কাছে আজও সমস্ত ঘটনাটা একটা রহস্য হয়েই রয়ে গেছে।

আমি উদগ্রীব হয়ে ওর মুখের দিকে চেয়ে রইলাম।

বাসু বলতে লাগল ধীরে ধীরে, থেমে থেমে, ভেবে:

আমার একটি ঠাকমা ছিলেন। বুড়োমানুষ হলে যা হয়—মেজাজ তাঁর খুবই খিটখিটে ছিল। ভোর থেকে রাত্রি দশটা-এগারোটা পর্যন্ত মায়ের সঙ্গে তাঁর খিটিমিটি চলতই। ঠাকমার যতই বয়স বাড়তে লাগল, শরীর যতই অশক্ত হতে লাগল, তাঁর সেবায় মায়েরও ততই ত্রুটি ঘটতে লাগল—খিটিমিটিও ততই বাড়তে লাগল।

সে এক দারুণ অশান্তি। বাড়িতে কাক চিল বসবার জো রইল না।

শুকদেব ছিল ঠাকমার প্রিয়। সে যে ঠাকমার খুব সেবা ও শুশ্রূষা করত, তা নয়। কিন্তু যেহেতু মায়ের আমি ছিলাম প্রিয়, আর শুকদেব খেত মায়ের বকুনি, সেইজন্যে ঠাকমার প্রিয় ছিল সে। এই অবস্থায় একদিন ঠাকমা গেলেন।

শ্রাদ্ধ শান্তি চুকে গেল। কিন্তু শুকদেব যেন কেমন হয়ে যেতে লাগল। অত যে আড্ডাবাজ ছেলে, কেমন যেন কুনো হয়ে যেতে লাগল। বন্ধুবান্ধব এসে ডাকাডাকি করেও তার সাড়া পায় না।

মা বারবার জিগ্যেস করেন, কি হয়েছে তোর? দিন রাত্তির বসে বসে কি ভাবিস? শরীর ও-রকম হয়ে যাচ্ছে কেন?

তারও জবাব দিতে পারে না।

আমি তখন মেডিক্যাল কলেজে পড়ি। মা আমাকে বললেন। আমিও প্রশ্ন করে কোনো সদুত্তর পাই না।

ও তখন কলেজে পড়ে। হস্টেলে থাকে। একদিন হঠাৎ হস্টেলের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট কয়েকটি ছেলে সঙ্গে দিয়ে ওকে আমাদের বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন। বাবাকে একখানা চিঠিতে জানিয়ে দিলেন, ওকে হস্টেলে রাখা নিরাপদ নয়।

বাবা তো আকাশ থেকে পড়লেন। শুকদেব দুষ্টু ছেলে সন্দেহ নেই—কিন্তু খারাপ ছেলে নয় নিশ্চয়ই। এমন কিছু সে করতে পারে না, যাতে হস্টেল থেকে তাকে তাড়িয়ে দেওয়া ছাড়া উপায় নেই।

কলেজের যে ছেলেগুলি ওকে পৌছে দিতে এসেছিল তাদের জিগ্যেস করে বাবা এই পর্যন্ত জানতে পারলেন যে, ওর মাথা ঠিক সুস্থ নয়। রাত্রে টেবিলে পড়ছে, হঠাৎ কী যে হয়ে গেল বিড়বিড় করে আপন মনে বকতে লাগল, ওকে সামলানো যায় না।

বাবা ডাক্তার মানুষ। তাঁর সন্দেহ হল মস্তিষ্ক বিকৃতির পূর্বলক্ষণ নয় তো?

কিন্তু জানেনই তো, তাঁর প্রচণ্ড প্রাকটিস্। নিজের ছেলেকেও চোখে চোখে রেখে তাকে পর্যবেক্ষণ করবেন, তার সময় নেই। মাঝে মাঝে অবসর পেলে কাছে ডাকেন, গল্প করেন, অনেক সময় কঠিন কঠিন বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব নিয়ে আলোচনাও করেন। কিন্তু মস্তিষ্ক-বিকৃতির কোন চিহ্নই দেখতে পান না।

শেষে বিরক্তভাবে মাকে বললেন একদিন, কিছুই হয় নি। মাথা বেশ সুস্থ আছে। বোধ হয় পড়াশুনা করার ইচ্ছা নেই, তাই ও রকম করছে।

সে রকম সন্দেহ হওয়া বিচিত্র নয়। ছেলে পড়াশুনায় খারাপ নয়। কিন্তু পড়াশুনায় আশ্চর্য ঢিলেমি। যেবার ম্যাট্রিক দেয়, পরীক্ষার আগের দিন বেঁকে বসলো, পরীক্ষা দেবে না। পড়া কিছু তৈরি হয় নি—দিলে নির্ঘাত ফেল করে যাবে।

বাবা কোন কথা শুনলেন না। জোর করে পরীক্ষা দেওয়ালেন। ফল বেরুলে দেখা গেল, প্রথম বিভাগেই পাস করেছে। ভারী খেয়ালী ও চিরকাল।

মা রেগে বললেন, তা হলে থাক বাড়িতে বসে। পড়ে আর কাজ নেই। নিজেই ঠেলা পাবে।

আমার স্ত্রী প্রায় ওর সমবয়সী। দুজনে ভাবও খুব। সে হেসে আমাকে বললে, ভায়ের বিয়ে দিয়ে দাও, সব সেরে যাবে।

মনে হল, তাও অসম্ভব নয়। হয়তো বিয়ের জন্যে খুব ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। অন্য কাউকে তো বলতে পারছে না, বলছে হয়তো ওর বউদিদিকে।

জিগ্যেস করলাম, সেকথা বলেছে নাকি তোমাকে?

—না, বলে নি অবশ্য কিছুই। কিন্তু আমার তাই সন্দেহ হয়। বিয়ের প্রসঙ্গ তুললে বেশ খুশি হয়ে ওঠে।

বললাম, মাকে বল।

আমার স্ত্রী মাকে বললেন, মা বাবাকে। কিন্তু বাবার অখণ্ড বিশ্বাস ওর কিছুই হয় নি। আসলে ও আর পড়াশুনো করতে চায় না—তিনি রেগে বললেন, তোমাদের যা খুশি কর। ওর কথা আমার কাছে কিছু বলো না।

সুতরাং বিয়ের প্রস্তাব চাপা পড়ে গেল।

কিন্তু মা এবং আমার স্ত্রীর দৃঢ় বিশ্বাস, ওর মধ্যে একটা কিছু হচ্ছে— যেটা ও কিছুতে বলছে না। স্নান-আহার, গল্প-গুজব সাধারণভাবে ঠিকই আছে। কিন্তু মাঝে মাঝে এক-একদিন, খুব ক্বচিৎ অবশ্য, খেতে-খেতে কিংবা গল্প করতে করতে হঠাৎ কেমন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল, কেমন স্থির দৃষ্টিতে দূরের দিকে চেয়ে রইল, ঠোঁটে রহস্যময় হাসি, সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত— দেখতে ভয় করে।

মায়ের আশঙ্কা হল, ভৌতিক কিছু নয় তো?

বাবা এবং আমি হেসে উড়িয়ে দিলাম। বাবা বললেন, ও পাগলাটার সংস্রব ছাড়, নইলে তোমরাই শেষ পর্যন্ত পাগল হয়ে যাবে।

এমনি করেই দিন চলে।

একদিন সন্ধ্যার সময় শুকদেব তার শোবার ঘরে খাটের উপর বসে আছে। তার শরীরটা সেদিন খুবই খারাপ। অন্য কিছু নয়, বলছে, বুকের ভিতরটা কেমন ভারি বোধ হচ্ছে এবং চোখ দুটো অসম্ভব জ্বালা করছে।

মা নীচে রান্নাঘরে ঠাকুরকে রাত্রের রান্না বুঝিয়ে দিচ্ছেন। আমার স্ত্রীকে বললেন, তুমি শুকনের ঘরে গিয়ে একটু বসো গে বৌমা। ওর শরীরটা ভাল নেই বলছে। একটু পরেই আমি যাচ্ছি।

আমার স্ত্রী চৌকাঠের কাছে বসে শুকদেবের সঙ্গে গল্প করতে লাগল। আজে বাজে গল্প :

—তুমি নাকি বাপের বাড়ি যাচ্ছ বউদি?

—হ্যাঁ।

—কেন? এই তো এলে সেদিন।

—তা তো এলাম। কিন্তু থেকেই বা কি করব বল? সামনে চোত মাস পড়ে যাচ্ছে। এর মধ্যে তো আর তোমার বিয়ে হচ্ছে না, সে আশা থাকলে থাকতাম।

—ও! আমার বিয়ের জন্যেই বুঝি তোমার এখানে থাকা?

—তা ছাড়া আর কি!

মা বোধ হয় একবার এসেছিলেন। কিন্তু সিঁড়ি থেকেই ওদের হাস্য-পরিহাস শুনে আবার নীচে নেমে যান।

হঠাৎ শুকদেব বললে, একটা দেশলাই বাক্স এনে দেবে বউদি। সিগারেট খাব।

আমার স্ত্রী নীচে থেকে একটা দেশলাই বাক্স এনে দিলে।

সিগারেটটা ঠোঁটে চেপে একটা কাঠি জ্বেলেই শুকদেব যেন কী রকম হয়ে গেল। তার ঠোঁটদুটো এমন জোরে-জোরে কাঁপতে লাগল যে, সিগারেটটা পড়ে গেল। ওর কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপই নেই। চোখের দৃষ্টি ওর ওদিকের দেওয়ালের দিকে নিবদ্ধ। সেদিকে কাকে যেন ও দেখছে, তার কথা শুনতে শুনতে ওর চোখদুটো যেন অস্বাভাবিক জ্বালায় জ্বলতে লাগল। সেই দিকে চেয়ে ও একটার পর একটা কাঠি জ্বেলেই চলে।

—ও কি ঠাকুরপো! ও কি করছ?—কোনমতে আমার স্ত্রী মৌখিক একবার বাধা দিলে বটে, কিন্তু শুকদেবের চোখ-মুখের অস্বাভাবিক অবস্থার দিকে চেয়ে ভয়ে ওর নিজেরই গলা শুকিয়ে এল।

ওই দৃশ্য আর সে সইতে না পেরে ছুটে চলে গেল নীচে।

—ও মা, শীগগির আসুন। ঠাকুরপো কি করছে দেখুন।

মা ভাঁড়ারে ব্যস্ত ছিলেন। সাড়া দিলেন: যাচ্ছি, তুমি যাও।

আমাদের ভাঁড়ার আর রান্নাঘরটা বাড়ির এক দূর প্রান্তে। আমার স্ত্রী উন্মাদের মত সেই দিকে ছুটল। মায়ের আঁচল ধরে টেনে বললে, শীগগির আসুন, ঠাকুরপো যেন কী রকম হয়ে গেছে।

—কী হয়ে গেছে?

—খালি একটার পর একটা দেশলাই কাঠি জ্বালছে আর কি রকম করে দেওয়ালের দিকে চাইছে। ভয় করছে!

মা কথাটার খুব গুরুত্ব দিলেন না। হেসে বললেন, জানে তো তুমি ভীতু মেয়ে তাই তোমাকে ভয় দেখাচ্ছে। যাও তুমি ঘরে গিয়ে বসো গে, আমি এখুনি যাচ্ছি।

আমার স্ত্রীর কিন্তু একা যেতে ভয় করছিল। এমন সময় পাশের বাড়ির গাঙ্গুলী গিন্নীর মোটা ভারী কণ্ঠস্বর শোনা গেল: ও ভূতো, চাটুজ্জেদের দোতলার ঘর থেকে অত ধোঁয়া বেরুচ্ছে কিসের, দেখে আয় তো।

আমার স্ত্রী এবং মা দুজনেই চমকে উঠলেন। ছুটলেন দোতলায়—পিছনে-পিছনে ঝি-চাকরগুলোও। কিন্তু···

বাসুদেব থামল।

বাসুদেব বলতে লাগল :

সঙ্গে সঙ্গে মোটরে করে তাকে এখানে হাসপাতালে আনা হল। ঘটনার সময় আমি ছিলাম না। কিন্তু হাসপাতালে আনার পর থেকে প্রায় সমস্তক্ষণ আমি তার পাশে থাকতাম। মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র বলে সে সুবিধা আমি পেয়েছিলাম।

সমস্ত শরীর এমন কি মুখ পর্যন্ত পুড়ে এমন বীভৎস হয়ে গিয়েছিল যে, সেদিকে চাওয়া যেত না। অথচ ওর চোখে-মুখে যন্ত্রণার চিহ্ন পযন্ত ছিল না। এই অবস্থায় সে দিন-দুই ছিল।

মৃত্যুর আগের দিন নিরিবিলি পেয়ে জিগ্যেস করেছিলাম, কেন এমন করলি ?

কথা কইতে শুকদেবের কষ্ট হচ্ছিল। কোন রকমে বললে, তোমাদের বলিনি—বললে হয়তো বিশ্বাসও করতে না—মৃত্যুর পরে ঠাকমা প্রায়ই আমাকে আত্মহত্যা করার লোভ দেখাতেন। তাঁকে স্পষ্ট চোখের সামনে দেখতে পেতাম। বলতেন, মর, মর, আগুন জ্বেলে মর ! দেখবি খুব আরাম ! লোভ হত। অনেকবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু কেউ-না-কেউ এসে পড়ায় বাধা পেয়েছি। সেদিন দেশলাইটা জ্বালামাত্র ঠাকমা আবার দেখা দিলেন, আবার মরবার প্ররোচনা দিতে লাগলেন। কিন্তু বউদি বসে, আমি পেরে উঠছিলাম না। হঠাৎ বউদি উঠে যেতেই আমি দাঁড়ালাম। ঠাকমা যেন ঠেলতে ঠেলতে আমাকে পাশের ঘরে নিয়ে গেলেন। আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন কেরোসিনের ভর্তি টিন। সেই কেরোসিন ঢাললাম মাথায়, জ্বালিয়ে দিলাম আগুন। তারপরে······

জিজ্ঞাসা করলাম, যন্ত্রণা হচ্ছে খুব ?

—না।

আর কিছু বললে না শুকদেব।

রাত্রি হয়ে আসে। জনস্রোত ঈষৎ মন্দীভূত।

কতক্ষণ নিঃশব্দে বসে ছিলাম জানি না। মুখ তুলে চেয়ে দেখি, চারিদিকের আলো জলের উপর প্রতিফলিত হয়ে যেন ইন্দ্রজাল রচনা করেছে। গাছের তলায় যেখানে আমরা বসেছিলাম সেখানটা অন্ধকার। বাসুদেবের মুখ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল না।

আমার চোখে কি কিছুর ছায়া লেগেছে? কিছুই চিনতে পারছি না কেন? বাসুদেবকেও না, চিরপরিচিত দীঘিকেও না, চারিপাশের আবেষ্টনকেও না।

॥ দনুজমর্দনী সমিতি ॥

সভাটা বসেছে রাজজ্যোতিষী উমেশ বটব্যালের 'জ্যোতিষ-গবেষণা-ভাণ্ডারে'। ছাব্বিশ থেকে ষাট পর্যন্ত বয়সের বহু পুরুষের সমাগম হয়েছে।

বটব্যাল মশায়ের গায়ের রং বর্ষণভূয়িষ্ঠ মেঘের মত, কিন্তু মসৃণ নয়, লোমশ। পরিধানে রক্তাম্বর। ফলে বর্ষার সূর্যাস্ত-শোভার মত প্রথম দর্শনেই মনকে আকৃষ্ট করেন। বিপুল কলেবর। হাতে, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। টাকের কল্যাণে শিখাটি শীর্ণ। সামনের দুটি দাঁত নেই। তার জন্যে এবং হাঁ-মুখ অত্যন্ত বড় হওয়ায়, যখন তিনি কথা বলেন, মনে হয় যেন তিনি বিশ্ব-চরাচর গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছেন।

সভা তাঁরই 'গবেষণা-ভাণ্ডারে', কিন্তু সভাপতি তিনি নন। সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেছেন ডক্টর এককড়ি হালদার মহাশয়। ইনি প্রাচীন ইতিহাসের অধ্যাপক এবং সেটা দৃষ্টিমাত্রেই বুঝা যায়। বয়স হয় তো সবে পঞ্চাশ অতিক্রম করেছে, কিন্তু দেখলে মনে হয় মহারাজ হর্ষবর্ধনের সমসাময়িক। গায়ের রং অদ্ভুত ধরনের—পীতাভ-শ্বেত এবং চামড়াটা এমন আলগা-ভাবে দেহের উপর ভাসছে যে, মনে হয় হাত বুলিয়ে গেলে সেটা দুধের সরের মত উঠে আসবে। পাঞ্জাবি ও উত্তরীয় অতি আলতোভাবে গায়ে চড়ানো, যেন তাঁর ভয় আছে, একটা দমকা হাওয়ায় তা টুকরো টুকরো হয়ে উড়ে যেতে পারে।

তিনি উঠে দাঁড়িয়ে শীর্ণকণ্ঠে, যেন যুগান্তরের ওপার থেকে বটব্যাল মশাইকে সভার উদ্দেশ্য বুঝিয়ে দেবার জন্যে আহ্বান করলেন।

মদমত্ত মাতঙ্গের মত উঠে দাঁড়িয়ে বটব্যাল মশাই কম্বুকণ্ঠে বলতে লাগলেন :

সভাপতি মহাশয় এবং সমবেত ভদ্র মহোদয়গণ, আজ আমরা স্বাধীনতা প্রাপ্ত হয়েছি, কিন্তু তা রাষ্ট্রীয়। বস্তুত এই ব্যাপারে রাষ্ট্রক্ষেত্রে আমরা যে পরিমাণ লাভবান হয়েছি, পারিবারিক ক্ষেত্রে ততোধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি এবং উভয়ক্ষেত্রেই শান্তি প্রনষ্ট হয়েছে। বন্ধুগণ, ইংরেজকে আমরা বিদূরিত করেছি ; কারণ তারা আমাদের অর্থ শোষণ করত। তাদের বিরুদ্ধে আমরা সংগ্রাম

করেছি। কিন্তু নারীদের মত এমন ধনেপ্রাণে শোষণ পুরুষকে কে করে থাকে? চেয়ে দেখুন নিজের পরিবারের দিকে এবং বুকে হাত দিয়ে বলুন, এমন শোষণকারিণী আর দ্বিতীয় কেউ আছে কি না।

বন্ধুগণ, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে আমরা নানা সদসদ উপায়ে অর্থোপার্জন করি। তার সমস্তই নিঃশেষে জলোকার মতো শোষণ করে নেয় নারীরা। কচ্ছপ্রান্তে লুকিয়ে রেখেও পরিত্রাণ নাই। অথচ দেখুন, জোঁকেরও পরিতৃপ্তি আছে, কিন্তু নারীদের পরিতৃপ্তি নাই। কিষাণ বলুন, মজদুর বলুন, হায়, আজ পুরুষের চেয়ে দুঃখী কে?

বটব্যাল মশায়ের কম্বুকণ্ঠ বেদনায় কোমল হয়ে এল। একটু থেমে, সামলে নিয়ে তিনি বললেন:

ভাই সব, এই অত্যাচারের প্রতিবিধান করতে হবে। 'সঙ্ঘশক্তিঃ কলৌ যুগে'। সুতরাং আমাদের সঙ্ঘবদ্ধ হতে হবে—সেই উদ্দেশ্যেই এই 'মহিলা-আত্মরক্ষা-সমিতি'। আসুন, আমরা সকলে মিলে একে শক্তিমান করে তুলি।

ব্যাটব্যাল মশাই বসলেন।

উঠলেন মহামহোপাধ্যায় পিনাকী তর্কভূষণ।

খর্বকায় ব্রাহ্মণ, নাতিস্থূল নাতিশীর্ণ দেহ। মাথায় ছোট ছোট করে ছাঁটা চুলের মধ্যস্থলে পরিপুষ্ট শিখায় একটি সাদা ফুল বাঁধা। গায়ে একখানি চাদর জড়ানো। তার ফাঁক দিয়ে মোটা এক গোছা উপবীত দেখা যাচ্ছে।

খনখনে গলার আওয়াজ। বললেন: শ্রীমান উমেশচন্দ্র যে কথা বললেন, আমি তা সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করি। নারীদের উৎপাতে গৃহ অরণ্যবৎ প্রতীয়মান হচ্ছে। গৃহের গৃহিণী আজ রাজপথের পরিব্রাজিকা। চিরকাল তাঁরা যুগপৎ রন্ধনও করেছেন আবার কেশবন্ধনও করেছেন। অধুনা তাঁরা সারাদিন শুধু কেশবন্ধনই করছেন, রন্ধন পরিত্যাগ করেছেন। আপনারা হয়ত অবগত নন, মানুষের আনন্দ বয়োবৃদ্ধিসহকারে সংকীর্ণ হতে হতে আমার মত বয়সে মাত্র আহারেই সীমাবদ্ধ হয়। কিন্তু বিবেচনা করে দেখুন, আমার সপ্তরোত্তীর্ণা সহধর্মিণী আজ সর্বকর্ম পরিত্যাগ করে ম্যাডাক স্কোয়ার 'দনুজ মর্দিনী সমিতির সহ-সভানেত্রী। তিনি কখন বাড়ি আসেন, কখন যান, শ্রীমধুসূদনই জানেন। আমার সঙ্গে কদাচিৎ দেখা হয়। আশঙ্কা করি, অকস্মাৎ যদি আমার মৃত্যু ঘটে, তাঁর সঙ্গে হয়তো দেখাই হবে না!

উপসংহারে হয়তো তাঁর সমিতিকে আশীর্বাদ করার অভিপ্রায় ছিল। কিন্তু ভাবাবেগে এইখানেই তাঁর বাকরোধ হল। তিনি বসে পড়লেন।

উঠলেন ব্যারিস্টার মিঃ মিহির আচারিয়া। পরিধানে নিখুঁত সাহেবী পোশাক। মাথায় ক্লোজ ক্রপ্‌ড্‌। চোখে কার-বিলম্বিত পাঁশনে। আবেগের মুখে কখনও খোলেন, কখনও লাগান: বলতে লাগলেন অত্যন্ত দ্রুতবেগে:

মিঃ মহামহোপাধ্যায় যা বললেন আমি তা support করি। কিন্তু অরণ্যের কথা কি তিনি বললেন, বুঝলাম না। আমার বাড়ি যদি একবার kindly আসেন (অবশ্য ফি লাগবে না), দেখবেন, নেপালী আয়া, বিহারী দাই, ওড়িয়া ঠাকুর, মগ বাবুর্চি, মাদ্রাজী টাইপিস্ট, পেশোয়ারী চাল, কাশ্মীরী শাল—এক কথায় মিসেসের establishment বলা যেতে পারে, epitome of India.

Gentlemen, লোকে বলে আমি দশ হাজার টাকা earn করি। অত নয়। To be frank, it is half as much এবং মিসেসের establishment-এর পক্ষে তা মরুভূমিতে বারিবিন্দু মাত্র। কলকাতার একশোটা সমিতির তিনি হয় সেক্রেটারী, ভাইস-প্রেসিডেণ্ট, নয় প্রেসিডেণ্ট, নিদেন পেট্রন। সুতরাং আমাকে দেনা করতে হয়।

মিঃ মহামহোপাধ্যায় দুঃখ করছিলেন, তাঁর সঙ্গে তাঁর স্ত্রীর দেখা হয় না। আমি ভাবি, হায়, সেই ভাগ্য যদি আমার হত! তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের সম্ভাবনায় আমার বুকের রক্ত হিম হয়ে আসে।

এবং বোধ করি সেই কল্পনাতেই তিনি শিউরে স্তব্ধ হয়ে গেলেন। এবং অন্যমনস্কভাবে বসে পড়ে রুমাল দিয়ে চশমাটা পরিষ্কার করতে লাগলেন।

তখন উঠলেন বসন্ত পাকড়াশী।

স্কুলের মাস্টার। পরনে আধ-ময়লা ধুতির উপর একটি টুইলের শার্ট। পায়ে ছেঁড়া ক্যাম্বিসের জুতো। মাথার কোঁকড়ানো চুল অবিন্যস্ত।

বললেন:

আমি সামান্য লোক, ইস্কুলের মাস্টার। থাকি দুখানা ঘরের একটি ছোট ফ্ল্যাটে। লোক অল্প—আমরা দুজন আর বছর দু'য়েকের একটা বাচ্চা, আর একটি ঝি, তিনি একাধারে ঠাকুর এবং ঝি।

সামান্যই মাইনে পাই ইস্কুল থেকে। সুতরাং সকালে দু-টো আর বিকেল থেকে রাত্রি দশটা পর্যন্ত তিনটে ট্যুইশান করতে হয়। সব মিলিয়ে যা পাই, তাতে কুলিয়ে যায় কোনমতে। যাচ্ছিলও, কিন্তু আর যাচ্ছে না। কেন, বলি।

মাস ছয়েক হল তাঁকে দেশপ্রেমে ধরেছে। তিনি কোথায় যান, কি করেন, তার আর পাত্তা পাই নে। ঝিয়ের হাতে সংসার, টাকা উড়ে যাচ্ছে জলের মত। তা যাক গে, কিন্তু ছেলেটা যে মারা যায়! সে বেচারা না পায় তাঁকে,

না পায় আমাকে। একদিন মশাই, হারিয়েই গেল। এর কি প্রতিকার করা যায় বলুন।

পাকড়াশী এমন হাঁপাতে লাগলেন যে, ভয় পেয়ে সবাই তাঁকে এক রকম জোর করেই বসিয়ে দিলেন।

উঠলেন টুকু দত্ত।

ছোট্ট মানুষ। কিন্তু ওই আয়তন ছাড়া আর সবই বড়: সুমুখের বড় বড় চুল থেকে থেকে চোখ পর্যন্ত ঢেকে দেয়; বড় ঘনকৃষ্ণ দাড়ি নাভি পর্যন্ত প্রলম্বিত; কণ্ঠস্বর চিলের মত শীর্ণ এবং তীক্ষ্ণ; পাঞ্জাবির আস্তিন আঙুল ছাড়িয়ে আরও আধ হাত এবং হাঁটু ছাড়িয়ে ঝুল; কোঁচা এক হাত মাটিতে লোটাচ্ছে আর নাগরার শুঁড় পা ছাড়িয়ে আরও চার আঙুল।

টুকু দত্ত কবিতা লেখে না, কিন্তু প্রতিশ্রুতি আছে। চোখের দৃষ্টি উদাস এবং ভাবালু। সুর করে টেনে টেনে বলাটা তার একটা নিজস্ব ভঙ্গী। একটি লাইন বলে, আর একটি প্রশ্ন করে, আর নিজেই তার উত্তর দেয়।

টুকুদত্ত টেনে টেনে সুর করে বলতে লাগল:

মীরা পালধি···মীরা পালধি···মীরা পালধি···

কে সে?

সে ক্লিওপেট্রা, সে গ্রেটা গার্বো, সে আনাপাবলোভা, সে কে নয়? তারই জন্যে আমি মুসাফির, আমি দেওয়ানা, আমি ফকির।

সে কোথায়?

জানিনে। খেলার মাঠে খুঁজেছি, পাই নি। সিনেমা হলে খুঁজেছি, পাই নি। রেঁস্তোরাঁয় কফি হাউসে খুঁজেছি, পাই নি। দিল্লির লালকেল্লা, আলমোরা নৃত্যশালা, কাশ্মীরের জোজি-লা, বম্বের সিনেমা-স্টুডিয়ো সবই তো খুঁজলাম।

তবে কি তাকে পাব না?

মস্তিষ্ক বলে, না, না, না। কিন্তু মন বলে পাব, পাব, পাব। তাকে যে আমার পেতেই হবে।

কেন? ঠেকাটা কি?

বলছি মহাশয়গণ! কি কুক্ষণে শরৎবাবু প্রেমের গল্প লিখলেন, মেয়েরা পাশের বাড়ির বড় লোকের ছেলের চাবির রিং আঁচলে বেঁধে ঝনাৎ করে পিঠে ফেলতে শিখলে, আর আমি দেউলে হলাম। মশাই গো, সে যে আমার চাবির রিং নিয়ে সরেছে! আমি যে আজ সর্বহারা!

আবেগে টুকু দত্ত এমন করে কাঁপতে লাগল যে, পাশের লোকগুলো ওকে

ধরতে যাচ্ছিল। এমন সময় টুকু দত্ত যেন ঘি পেয়ে আগুনের মত জ্বলে উঠল :

আসুন সর্বহারা পুরুষের দল ! নারীর এই অত্যাচারের আমরা প্রতিবিধান করি, মহিলাদের উৎপীড়ন থেকে আত্মরক্ষা করি। বন্দে মাতরম্।

সর্বশেষে উঠলেন সভাপতি মহাশয়।

বলতে লাগলেন :

আপনাদের সকলের কথা শুনে বোঝা গেল, আমরা, পুরুষেরা, আজ কি অসহায়। আমাদেরই সব অথচ কিছুই নেই। ইংরেজ আমাদের শুধু স্বাধীনতা হরণ করেই তৃপ্ত হয় নি, আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্য থেকে ভ্রষ্ট করেছে।

সেই প্রাচীনকালে কী সুখের দিনই না আমাদের ছিল, কী অবাধ বিচরণ ক্ষেত্র ! আজ আমাদের একটিমাত্র স্ত্রী, তাঁকেও ঘরের মধ্যে রাখতে পারছি না। উদয়াস্ত পরিশ্রম করে এবং কর্মফল সমস্তই তাকে সমর্পণ করেও মন পাচ্ছিনা। আর তখন শত পত্নীর স্বামীর জীবনেও দুঃখ ছিল না, দুশ্চিন্তা ছিল না।

সেই প্রাচীন আনন্দময় দিনের কথা একবার ভেবে দেখুন : 'দেশে দেশে কলত্রাণি'। এই প্রকারে তিনশো পয়ষট্টিটি কলত্রাণি। প্রতি রাত্রে নিত্য নতুন শ্বশুর বাড়ির আদর যত্ন। গৃহের চিন্তা নেই, গৃহিণীর অভাব নেই, উপার্জনের ধাক্কা নেই। খালি খাও-দাও-আনন্দ কর।

সেই সুখের দিন কোথায় গেল। আমাদের সমবেত চেষ্টায় তা কি আমরা ফিরিয়ে আনতে পারি না? এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে আমরা কি জীবনপণ সংগ্রাম করতে পারি না?

মিঃ আচারিয়া উঠে দাঁড়িয়ে বললেন : Excuse me, ও-কথাটা, মানে ওই জীবনপণের কথাটা আমি ভেবেছি। কিন্তু মুশকিল কি জানেন, ডাইভোর্স আইন পাশ হতে চলেছে ; সুতরাং ওতে আর নারীরা ভয় পাবে না।

—তা হলে?—হতাশভাবে ডক্টর হালদার জিজ্ঞাসা করলেন—তা হলে আর কি আমরা করতে পারি?

মিঃ আচারিয়া বললেন : সেই তো সমস্যা। আইন কোন সাহায্যই করছে না। তা হলে বাকি রইল শক্তি, গায়ের জোর। সেদিকেও মুশকিল দেখুন ; গুরু পরিশ্রমে আমরা যত দুর্বল হচ্ছি, পায়ের ওপর পা দিয়ে খেয়ে ওরা ততই শক্তিমান হচ্ছেন।

মহামহোপাধ্যায় গম্ভীরভাবে সংশোধন করে দিলেন, শক্তিমতী।

—আজ্ঞে হ্যাঁ, শক্তিমতী। এখন ভাবতে হবে আমরাও কি ভাবে শক্তিমতী হতে পারি।

মহামহোপাধ্যায় আবার সংশোধন করে দিলেন, শক্তিমান।

—আজ্ঞে হ্যাঁ, শক্তিমান। অবশ্য আমরা সকলেই কিছু দুর্বল নই। আমি কিংবা মিঃ মহামহোপাধ্যায় যেমন দুর্বল, তেমনি মিঃ বটব্যাল···

মিঃ বটব্যাল হতাশভাবে মাথা নাড়লেন:

—আমার কলেবর দেখে বিভ্রান্ত হবেন না মিঃ আচারিয়া। ব্রহ্মাণ্ডের মত এরও তিনভাগই জল একভাগ মাত্র স্থল।

মিঃ আচারিয়া কুণ্ঠিতভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার গৃহিণী কি···

—আজ্ঞে হ্যাঁ—তিনিই তো দনুজমর্দিনী সমিতির সম্পাদিকা।

—তিনিও কি আমারই মিসেসের মত···

(বাইরে বামাকণ্ঠে ধ্বনিত হল: এখানে কিসের সভা?) তারই মধ্যে মিঃ আচারিয়া তাঁর বাক্য শেষ করলেন: মারেন? বটব্যাল তাড়াতাড়ি বললেন, যাকে বলে প্রহার পটিয়সী।

—তা বুঝলুম। মারেন কি না?

—প্রচণ্ড। পালান, ওই তিনি আসছেন।

দেখতে দেখতে দরজা দিয়ে বটব্যাল-গৃহিণী এবং তাঁর দনুজমর্দিনী সমিতির সভ্যাগণ হুড়মুড় করে ঢুকে পড়লেন। প্রত্যেকের হাতে একটি করে কাঠের বেল্‌না।

ক্ষীণ ত্রস্তকণ্ঠে বটব্যাল আবার বললেন, পালান পালান।

কিন্তু কে কোথায় পালাবে? কোন দিকে পালাবে? দরজা আগলে শতাধিক দনুজমর্দিনী। 'পুরুষের বক্ষরক্তধারা' স্তব্ধপ্রায়।

ধীরে বলিষ্ঠ পদে বটব্যাল-গৃহিণী ঘরের মধ্যস্থলে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর বিপুল কলেবর বেষ্টন করে একখানি চওড়া লালপাড় শাড়ি গাছ-কোমর বেঁধে পরা। ক্রোধে আরক্ত চক্ষু, কালো ভাঁটার মত ঘুরছে। নাসারন্ধ্র ঘন ঘন বিস্ফারিত এবং ফাঁদি-নথ প্রকম্পিত হচ্ছে। কটমট করে তিনি সমবেত ভদ্রমহোদয়গণের দিকে চাইলেন।

সেই প্রজ্বলন্ত দৃষ্টির সামনে সকলেই চোখ নামিয়ে নিলেন।

গৃহ নিস্তব্ধ।

হঠাৎ তিনি গর্জন করে উঠলেন: অ্যাও!

সবাই চমকে উঠলেন।

রক্তাম্বরধারী বটব্যাল নিঃশব্দে উঠে দাঁড়ালেন।

—ইধারাও!

এবং তারপরে কাঁচপোকা যেমন করে তেলাপোকাকে টেনে নিয়ে যায়, তেমনি করে বটব্যালকে টেনে নিয়ে চলে গেলেন।

॥ কাবুলীওয়ালা ॥

বছর ত্রিশেক আগের কথা।

প্রথম বসন্তের উজ্জ্বল প্রভাতে নিমতলার ছায়ায় একটি মোড়ায় বসে রমেশ রবীন্দ্রনাথের 'কাবুলীওয়ালা' গল্পটি পড়ছিল।

এদিকে এ সময় এ রকম দুষ্কার্য কেউ করে না।

নিবারণ স্বর্ণকারের দাওয়ায় বসে গেছে প্রকাণ্ড বৈঠক। গল্প হচ্ছে নানা রকমের। গত রাত্রে পাশাখেলায় গোবর্ধন রামপদকে কি রকম হারিয়েছে, সে গল্পটা শেষ হওয়া মাত্রেই এল জীবনডাঙ্গার দোল-ফেরত সীতানাথ। সে আরম্ভ করলে সেখানকার ধুমধামের গল্প।

ওদিকে হলধর তন্তুবায়ের তাঁতঘরের সামনে আরম্ভ হয়েছে ঘোষেদের সঙ্গে মিত্রদের মামলার গল্প। সেও জমেছে মন্দ নয়। আইনের অনেক বড় বড় কথা অত্যন্ত সহজ করে আলোচনা করছে নবীন গোমস্তা। পথ-চলতি রাহী লোকও একটু থেমে দু-টান তামাক টানার উপলক্ষ্যে সেখানে বসে ফৌজদারি আইন সম্বন্ধে জ্ঞান সঞ্চয় করে নিচ্ছে।

আর আড্ডা বসেছে রমাই বৈরাগীর করবীতলায়। রমাই একতারা আর ডুবকি বাজিয়ে গান করছে। তাকে ঘিরে বহু ছেলে-বুড়ো জড়ো হয়েছে। এমন কি, তার সুমধুর কণ্ঠে মুগ্ধ হয়ে ঘাটে যাওয়ার পথে মেয়েরাও আড়ঘোমটা টেনে একপাশে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

ত্রিশ বৎসর আগে এই গ্রামে প্রথম বসন্তের এই উজ্জ্বল প্রভাতে এই ছিল প্রধান কয়েকটি আড্ডা। কিন্তু রমেশের সঙ্গে এর কোনোটির যোগ নেই।

আগে যে যোগ ছিল না তা নয়। বরং যথেষ্টই ছিল। এই গ্রামেরই ছেলে রমেশ। তার বাল্য, কৈশোর এবং প্রথম যৌবন এইখানেই কেটেছে। ওই গগন পণ্ডিতের পাঠশালায় তার হাতে খড়ি; কোমরে কাপড় জড়িয়ে, শীতের দিনে দোলাই গায়ে দিয়ে ওই দীঘির ঘাটে সে কাঠকয়লা দিয়ে স্লেট মেজেছে কতদিন। তারপরে গেছে হাই স্কুলের পালা। সেখান থেকে জেলার শহরে কলেজে। তখনও আড্ডাগুলির সঙ্গে তার যোগ ছিল খুবই ঘনিষ্ঠ।

কিন্তু তারপরে কলকাতায় এম-এ পাশ করে যখন কলকাতারই এক

কলেজে অধ্যাপকের চাকুরি পেল, তখন থেকেই গ্রামের অন্তরের সঙ্গে তার যোগসূত্র ক্রমশ শীর্ণতর হতে লাগল। এবং আজকে দেখা গেল, এমন সুন্দর বসন্ত প্রভাতে সে কোথাও না গিয়ে নিমতলার ছায়ায় বসে রবীন্দ্রনাথের 'কাবুলীওয়ালা' পড়ছে।

অত্যন্ত স্নেহপরায়ণ এক কাবুলীওয়ালা। এই সুদূর প্রবাসে একটি বাঙালী মেয়ের মুখে তার নিজের মেয়ের ছবি দেখে তার বিরহ-কাতর পিতৃহৃদয় মুগ্ধ হয়েছে। সেই রসে রমেশের নিজের চিত্তও ধীরে ধীরে অভিসিঞ্চিত হচ্ছিল।

এমন সময় তার একান্ত সন্নিকট দিয়ে ইঁদুরের মত গুঁড়ি মেরে কে যেন তীরবেগে তার বাড়ির ভিতরে চলে গেল।

রমেশ ত্রস্তে বই থেকে মুখ তুললে।

লোকটাকে দেখা গেল না, কিন্তু তার পরিবর্তে দেখা গেল এক কাবুলীওয়ালা মূর্তিমান যমদূতের মত সামনে দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছে। পরনে পুরো একথান কাপড়ের পায়জামা, গায়ে তেমনি বিপুলাকার একটি ঢিলা পাঞ্জাবির উপর মখমলের জরিদার ওয়েস্টকোট। মাথায় কালো শৃঙ্গ-ওয়ালা পাগড়ি। শুঁড়তোলা নাগরা থেকে পায়জামা, পাঞ্জাবি, দাড়ি এবং পাগড়ি পর্যন্ত ধুলায় মলিন। অতদূর থেকেও তার উগ্র কটু গন্ধ রমেশের নাকে এসে লাগল।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ রমেশের চিত্ত কাবুলীওয়ালা সম্বন্ধে এমন কোমল করে এনেছিলেন যে, রমেশ সেই উগ্র কটু গন্ধেও বিরক্ত হল না।

বরং মধুর কণ্ঠেই জিজ্ঞাসা করলে, কি খবর খাঁ সাহেব?

অকস্মাৎ এই সুবেশ সুশ্রী এবং সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের সামনে পড়ে খাঁ সাহেব প্রথমে একটু ভড়কে গিয়েছিল। রমেশের শান্ত কণ্ঠে তার স্বাভাবিক এবং স্বাদেশিক তেজস্বিতা পুনরায় ফিরে এল।

নিমগাছের গুঁড়িতে হাতের মোটা লাঠিটা ঠুকে হুমকির সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলে: কাঁহা ভাগলো উ শালা? জলদি নিকালো।

বলার সঙ্গে সঙ্গে তার পীতাভ অপরিচ্ছন্ন দন্তপাঁতি একটা হিংস্র ভঙ্গীতে চকচক করে উঠল।

সবিস্ময়ে রমেশ বললে, কাকে নেকলাবো খাঁ সাহেব? ব্যাপারটা কি?

উত্তরে খাঁ সাহেব যা বললে তা কাবুলীওয়ালার জিহ্বাতেই বলা সম্ভব, কিন্তু বাঙালীর কান তার শতাংশের একাংশ শুনলেও লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে।

ফলে রমেশের মনে যে অবস্থার উদ্ভব হল, রবীন্দ্রনাথের পক্ষেও তা

সামলানো অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল! ক্রোধে রমেশের মুখ লাল হয়ে উঠল। একটা আঙুল উঁচিয়ে রমেশ শুধু বললে, যাও। ভাগো হিঁয়াসে।

তার মুখের দিকে চেয়ে খাঁ সাহেবকে তেজস্বিতা সংবরণ করতে হল। সে কিছুই আর না বলে নিমগাছের গোড়ায় পচ্‌পচ্‌ করে বারকতক থুতু ফেলে মাটিতে লাঠিটা একবার ঠুকে গজগজ করে কি বলতে বলতে চলে গেল।

রমেশ স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ বসে রইল। ব্যাপারটা কি, কেনই বা এমন অকস্মাৎ রুদ্রমূর্তি এই কাবুলীওয়ালার আবির্ভাব এবং কাকেই বা বার করে দিতে হবে, কিছুই সে বুঝতে পারলে না।

ধীরে ধীরে আবার সে 'কাবুলীওয়ালা' গল্পে মনোনিবেশ করার চেষ্টা করলে কিন্তু গল্পের ধারার সঙ্গে তার চিত্তের সংযোগ যেন ছিন্ন হয়ে গেছে, রসের পাত্রে কে যেন দুটি লঙ্কার বিচি ছড়িয়ে দিয়ে গেছে। রসের সেই সুমিষ্টতা এবং সুস্নিগ্ধতা যেন কোথায় অন্তর্হিত হয়েছে।

সমস্ত সকালটাই রমেশের নষ্ট হয়ে গেল।

সে ভাবছে।

এমন সময় হঠাৎ নিবারণ স্বর্ণকার রমেশের পায়ের গোড়ায় ঢিপ করে একটা প্রণাম করে জিজ্ঞাসা করলে দাদাবাবু, ভালো তো?

—হ্যাঁ। তোমরা ভালো আছ?—অন্যমনস্কভাবে রমেশ উত্তর দিলে।

—আপনার ধমক খেয়ে সে ব্যাটা পালিয়ে গেছে, না?

নিবারণ একটা আরামের নিঃশ্বাস ফেলে নিমগাছের গোড়ায় পরম নিশ্চিন্ত ভাবে উবু হয়ে বসল।

রমেশ যেন সমস্যা সমাধানের কিনারা দেখতে পেলে।

হাতের বইখানা মুড়ে রেখে জিজ্ঞাসা করলে, কে ব্যাটা?

দুপাটি দন্ত বিকশিত করে নিবারণ উত্তর দিলে, ওই কাবলে ব্যাটা। ভারী ঝামেলায় পড়েছি বড়বাবু।

—কি ঝামেলা?

একগাল হেসে নিবারণ বললে, কি জানেন, ধারে খানকয়েক আলোয়ান কিনেছিলাম।

—তারপরে?

—তা চেষ্টা করেছি বড়বাবু, কিন্তু টাকাটা কিছুতেই জোগাড় করতে পারছি না।

রমেশ হেসে বললে, তাহলে তুমিই তখন আমার পাশ দিয়ে অমনি গুঁড়ি মেরে ছুটে পালালে।

না পালিয়ে কি করি বলুন। ওই তো দেখলেন চেহারাখানা। হাত চেপে ধরলে কব্জিটা ভেঙে যাবে। ওদের অসাধ্য কি কোন কাজ আছে বাবু? কটা টাকার জন্যে মাথায় লাঠিও মারতে পারে।

রমেশ এবারে বিরক্ত হল।

বললে—অতই যদি ভয়, তা হলে নাও কেন ওদের কাছ থেকে গায়ের কাপড়?

—নিই কেন?—নিবারণ সেইখানে ধুলার উপরেই বসে পড়ল। বললে, বাবুলীওয়ালার কাছ থেকে ছ-টাকার জিনিস ষোলো টাকায় কি লোকে সহজে নেয় মনে করেন? অনেক দুঃখেই নেয়। তা হলে বলি শুনুন—

নিবারণ তার দুঃখের কথা বলতে আরম্ভ করল :

এবারের শীতের কামড়টা তো দেখলেন বাবু। হাওয়া দেয়, আর ছেলে-মেয়েগুলো বাঁশপাতার মত হিলহিল করে কাঁপে। কারও কারও কাশি সর্দি. কারও ম্যালেরিয়া। গরীব হলেও বাপ তো। সে কষ্ট চোখে দেখা যায় না। তখন যদি ধারে কেউ আলোয়ান দেয়, কোন্ বাপ না নিয়ে পারে বলুন তো। তখন দাম দেখি নি, কিছু দেখি নি। কেবল ধারে পেয়েছি বলেই নিয়েছি। শুধু আমিই নই বাবু, এ গাঁয়ে পনেরো আনা লোকই তাই করেছে!

—বেশ করেছে। কিন্তু এখন?

—হ্যাঁ, এখন।—নিবারণ বিব্রতভাবে ঢোঁক গিললে!

তারপর বললে, টাকা দেব না তো বলছি না বাবু। দেব। চেষ্টাও করছি। শুধু দুদিন সময় চাইছি। কিন্তু ও যে কোন কথা শুনতে চায় না, শুধু জুলুম করে।

বলতে বলতে নিবারণ উত্তেজিত হয়ে উঠল।

—সে যে কী জুলুম বাবু, আপনার ধারণা নেই। মেয়েছেলের মান মর্যাদা পর্যন্ত থাকে না। ঘাটে-পথে বেরুনো অসম্ভব। বুঝুন তো কাণ্ডটা।

ক্রোধে নিবারণের প্রকাণ্ড প্লীহাস্ফীত উদর এবং অস্থিচর্মসার বক্ষ কামারের হাপরের মত আন্দোলিত হতে লাগল।

বাস্তবিক, গ্রামে বাঘ এলে যেমন হয় তেমনি অবস্থা হয়েছে

তিনটি কি চারিটি মাত্র কাবুলীওয়ালা। তারা এপাড়া থেকে ওপাড়া এবং ওপাড়া থেকে এপাড়া হামলা দিয়ে বেড়াচ্ছে। আর ভীত-ত্রস্ত গ্রামবাসীরা প্রাণভয়ে এবাড়ি ওবাড়ি ছুটে ছুটে বেড়াচ্ছে। কেউ কেউ বা গাছের উপরে গিয়ে লুকিয়েছে!

কেউ ধরা পড়ছে কেউ পড়ছে না।

যে ধরা পড়েছে, তার চিৎকারে যারা ধরা পড়ছে না তাদের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছে, বুক টিপটিপ করে উঠছে, ভয় হচ্ছে বুঝিবা বক্ষস্পন্দন থেমে যায়।

ভোর থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত এই কাণ্ড চলেছে আজ ক-দিন ধরে। শান্তি বলতে আর কিছু অবশিষ্ট নেই।

তখন বিকেল চারটে।

রোদ আছে, কিন্তু শীতের ঈষৎ আমেজ থাকায় ওটুকু রোদ গায়ে লাগে না। রমেশ একটা পাঞ্জাবি গায়ে দিয়ে গ্রামের পথে বেরিয়ে পড়ল।

তাদের বাড়ি থেকে যে সরু রাস্তাটা ঘোষেদের তেঁতুলতলার নীচে দিয়ে হাটতলার পাশ দিয়ে বড় রাস্তায় গিয়ে পড়েছে, সেইখান থেকে স্যাকরা পাড়ার শুরু। দুপাশে উঁচু দাওয়া-ওলা ঘর। দু-ভাঁজকরা চওড়া দরজা। সকল সময়েই একটা ঠুকঠুক একঘেয়ে শব্দ ওঠে।

রমেশ অবাক হয়ে দেখলে, দু-পাশের সমস্ত দোকানেরই পাল্লা বন্ধ। ঠুকঠুক শব্দ শোনা যাচ্ছে না, সব নিস্তব্ধ।

একটু এগিয়ে মোড় ফিরতেই দেখা গেল, নিবারণের দরজার সামনে মস্ত ভিড়। ভিড় বিশেষ করে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরই। তাদের মাথা ছাড়িয়ে দেখা যাচ্ছে কাবুলীওয়ালার পাগড়ির কালো অংশটা।

আবার কাবুলীওয়ালা!

রমেশ একটু এগিয়ে গিয়ে দেখলে, ভিজে গামছা পরে নিবারণ দাঁড়িয়ে। তার পা বেয়ে টসটস করে জল পড়ছে। তার একখানা হাত কাবুলীওয়ালার বলিষ্ঠ কর্কশ মুঠোর মধ্যে!

বেশ বোঝা যাচ্ছে সমস্তদিন কাবুলীওয়ালার ভয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়িয়ে এই সময়টা সে স্নান করে দুটো খেয়ে নেবার মতলব করছিল। ভেবেছিল, কাবুলীওয়ালা নেই, কিন্তু তার দুর্ভাগ্যক্রমে কাবুলীওয়ালা পাশেই কোথাও লুকিয়ে ছিল। নিবারণ বাড়ির সামনে এঁদো ডোবা থেকে স্নান করে উঠে আসতেই ধরেছে। তার থাবা থেকে হাতখানা ছাড়িয়ে নেয় এত শক্তি নিবারণের কেন, এ অঞ্চলের কারোই নেই।

নিবারণ করুণ কণ্ঠে বলছিল, তোমার টাকাটার জন্তেই আজ সমস্ত দিন ঘুরেছি। কোথাও কি পাওয়া যায়? অনেক কষ্টে যোগাড় হল। কাল সকালে তুমি নিশ্চয় পাবে খাঁ সাহেব।

ওর হাতে একটা ঝাঁকি দিয়ে খাঁ সাহেব বললে, তুম বড়া সেয়ানা আছে, না?

—মাইরি বলছি, মা কালীর দিব্যি। কাল সকালে তুমি নিশ্চয় পাবে।

খাঁ সাহেব যে ওর কথা বিশ্বাস করছে না, তা ওর মুখ দেখলেই বোঝা যায়। অনেক দিনের ফেরারী আসামী নিবারণ। বহুকষ্টে, একপ্রকার ভাগ্যক্রমেই, ওকে আজ সে ধরেছে। আজ ছেড়ে দিলে আবার কবে যে ওর দর্শন পাওয়া যাবে কে জানে।

খাঁ সাহেবের শ্মশ্রু-সংকুল ঠোঁটের ফাঁকে একটা কুটিল হাসি খেলে গেল।

বললে, কাল সকালে?

--কাল সকালে।

—জরুর?

'জরুর শব্দের অর্থ নিবারণ বুঝেছে কিনা সন্দেহ। তথাপি উৎসাহের সঙ্গে বার বার ঘাড় নেড়ে বললে, জরুর!

জনতা রুদ্ধশ্বাসে উভয়ের কথাবার্তা শুনে যাচ্ছিল। তাদের মনে ভরসা হল এবার নিবারণ ছাড়া পাবে। নিবারণের নিজেরও মুখে যে দুশ্চিন্তা, ভয় ও উদ্বেগের রেখা পড়েছিল তাও ধীরে ধীরে মিলিয়ে আসতে লাগল।

অনতিদূরে দাঁড়িয়ে রমেশ কৌতুক এবং কৌতূহলের সঙ্গে সমস্ত ঘটনা পর্যবেক্ষণ করছিল। সেও একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলবার উদ্যোগ করছিল।

হঠাৎ কাবুলীওয়ালা তার প্রকাণ্ড পাগড়ির উদ্বৃত্ত অংশ দিয়ে বাঁ হাতে নিজের চোখ দুটো চেপে ধরল, ডান হাতের মুঠোয় নিবারণের হাতখানা।

কী রে বাবা! সবাই অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে। কাবুলীওয়ালার চোখে কিছু পড়ল নাকি?

না, পড়ে নি। এক মিনিট পরেই কাবুলীওয়ালা চোখ খুলে নিবারণের দিকে হাতখানা প্রসারিত করে ভাঙা ভাঙা কর্কশ কণ্ঠে বললে, সকাল হো গিয়া। দেও রুপেয়া।

সকাল হো গিয়া? চোখ বন্ধ করলেই সকাল?

জনতা হো হো করে হেসে উঠল। এমন কি নিবারণও। কাবুলীওয়ালাও রসিকতা করতে জানে?

রমেশ আর থাকতে পারলে না।

এগিয়ে এসে বললে, বলছে কাল দিয়ে দেবে। তবে আর কেন ধরে রেখেছ? ছেড়ে দাও।

বাঘের মুখ থেকে শিকার ছাড়ানো বরং সম্ভব, কিন্তু কাবুলীওয়ালার কাছ থেকে নয়। রমেশের অনুরোধের প্রত্যুত্তরে যে ভাষা সে নিবারণের সম্বন্ধে প্রয়োগ করতে লাগল তা একমাত্র কাবুলীওয়ালার মুখ থেকেই বেরুতে পারে।

অনুরোধ-উপরোধে শুধু সেই ভাষারই শ্রীবৃদ্ধিসাধন হবে, আর কিছু হবে না, এই কথা ভেবে রমেশ নিঃশব্দে পকেট থেকে একখানা দশটাকার নোট বের করে ওর হাতে দিলে।

নিমেষে কাবুলীওয়ালার মুখের ভাব পরিবর্তিত হল। কি ভেবে জানি না, হা হা করে একবার সে অট্টহাস্য করে উঠল। ও-রকম আচমকা হাসিতে বুকের ভিতরটা ঢিপঢিপ করে ওঠে। তারপর সসম্ভ্রমে একটা সেলাম ঠুকে চলে গেল।

এরই দিন কয়েক পরে একদিন ভোরবেলায় তুমুল হট্টগোলের মধ্যে রমেশের ঘুম ভেঙে গেল।

অন্ধকার তখন অনেকখানি ফিকে হয়ে এসেছে, কিন্তু সূর্য উঠতে কিছু দেরি আছে। রমেশ চোখ রগড়াতে রগড়াতে নীচে নেমে এল। কিসের এ গোলমাল? বহু কণ্ঠে শুধু 'মার মার' ধ্বনি।

রমেশের মনে হল, গোলমালটা যেন ক্রমে এদিকেই আসছে। বেশ দ্রুত বেগে। কী ব্যাপার?

রমেশ চঞ্চল হয়ে উঠল।

কলহ-বিবাদ পাড়াগাঁয়ে লেগেই আছে। কিন্তু এত ভোরে কখনই বাধে না। এ অঞ্চলের লোকেরা একটু আয়েশী। ঘুম থেকে উঠে, ধীরে সুস্থে মুখ-হাত ধুয়ে তার পরে কলহ বাধায়। এত ভোরে নয়।

এত ভোরে 'মার মার' করে কারা?

কিন্তু বেশিক্ষণ রমেশকে গবেষণা করতে হল না।

সেদিনের সেই সাড়ে ছ ফুট লম্বা কাবুলীওয়ালা টলতে টলতে এসে নিমতলায় আছড়ে পড়ল। তার কপাল থেকে রক্ত ঝরে পড়ছে চোখ বেয়ে মুখের উপর। ময়লা পাঞ্জাবিটার জায়গা জায়গা রক্তে লাল। পিছনে তার তেড়ে আসছে দু-তিন শো লোক। কারও হাতে লাঠি, কারও হাতে কঞ্চি,

কারও হাতে বাঁকারি, আবার কারও বা হাতে বর্শা। দলে হিন্দু মুসলমান দুইই আছে।

রমেশ ছুটে গিয়ে ওদের মধ্যে দাঁড়িয়ে ওদের থামালে। সে কি থামানো যায়? বহু কষ্টেই থামালে।

তারপরে জিজ্ঞাসা করলে, ব্যাপারটা কি?

সবাই এরফানকে দেখিয়ে দিলে। রোগা, বেঁটে, ক্ষীণপ্রাণ, ম্যালেরিয়া-ক্লিষ্ট এরফানের তখন কথা কইবার শক্তি নেই। তার জবাফুলের মত লাল চোখ দুটো ভাঁটার মত ঘুরছে এবং শীর্ণ দেহ থেকে থেকে কেঁপে কেঁপে উঠছে।

তার ভাই ইয়াকুব বললে, ক-দিন থেকেই কাবুলীটা—তার দাদাকে খুঁজছিল, পাচ্ছিল না। আজ অনেক ভোর থাকতেই দুজন কাবুলী—একজন সদরে, একজন খিড়াকতে পাহারা বসিয়েছিল। এরফানের স্ত্রী ভোরে উঠে খিড়কির দরজা খুলেই কাবুলীকে দেখেই চমকে চিৎকার করে ওঠে এবং দরজা বন্ধ করবার চেষ্টা করে। কাবুলীটা ঠেলে—

বাধা দিয়ে কাবুলীওয়ালা বললে, নেই। হাম উসকো ছুঁয়া নেই। খালি লাঠি দে কর—

কিন্তু তার কৈফিয়ত শোনবার মত মনের অবস্থা কারও নেই। জনতা সমস্বরে কলরব করে উঠতেই রমেশ তাদের থামিয়ে কাবুলীওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করলে, তুমি কিছুই কসুর কর নি? খামাকা তোমাকে—

—বিলকুল খামকা বাবুজি। আমি ঔরতের গায়ে হাত দিই নি। ও আমার বেটির বয়সী।

রমেশের কল্পনায় খেলে গেল রবীন্দ্রনাথের কাবুলীওয়ালা। কে জানে, হয় তো এরও সাতটা জামার শেষেরটির পকেটে প্রবাসী কন্যার হাতের পাঞ্জা মধুক্ষরণ করছে। হয়তো ভুল ভেবেই এরা ওকে এমন নির্মম প্রহার করেছে। বেচারা কাবুলীওয়ালা!

কিন্তু তখনই তার চিন্তাসূত্র বিচ্ছিন্ন করে এরফান বোমা-ফাটার মত গর্জন করে উঠল: বেটির বয়সী! তুই দিস নি আমার বিবিকে খারাপ গালাগালি?

অম্লানবদনে কাবুলীওয়ালা স্বীকার করলো, জরুর দিয়া গালি। উসমে কেয়া?

ইয়াকুব বললে, দেখলেন? দাদা পালাচ্ছিল। কিন্তু সেই গালাগালি শুনে তার রাগ চড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে একটা কুড়ুল ছুঁড়ে…

নিবারণ বিচক্ষণ ব্যক্তি। এইখানে এসে মারামারির প্রথম উত্তেজনাটা কেটে যেতেই তার মনে জেগেছে, থানা পুলিস আর আদালত। সে তাড়াতাড়ি ইয়াকুবের হাতটা চেপে ধরে বললে, থাম্। বাজে বকিস নি। এরফান কুড়ুল পাবে কোথায়?

কাবুলীওয়ালা ধীরে ধীরে উঠে বসল। পাগড়ি দিয়ে কপালের রক্তটা মুছে ফেলে রমেশকে বললে, আমি কিছু কসুর করি নি বাবুজি। খালি রুপেয়া চাইতে গিয়েছিলাম। তুমি রুপেয়া দিয়ে দাও, আমি চলে যাই।

রমেশের বিস্ময়ের আর শেষ রইল না। মেয়ের বয়সী একটি স্ত্রীলোককে কুৎসিত গালি দিয়েছে, কিন্তু ওর বিশ্বাস ও কিছু কসুর করে নি। কুড়ুলের আঘাতে মাথা ফেটে গেছে, রক্ত পড়ছে। সেও কিছু নয়। এরফানের কাছে পাওনা টাকাটা রমেশ দিয়ে দিলেই ও খুশি হয়ে চলে যায়!

রমেশের হাতটা পকেটের কাছে এসে আবার থমকে গেল—কে জানে কেন

॥ অর্থভোগ্যা ॥

ওর নাম মাটি।

লোকে শুনে অবাক হয়: মাটি আবার কোনও মেয়ের নাম হয় না কি!

মাটিও কম যায় না। ঝাঁজের সঙ্গে বলে: না, হয় না! পৃথিবীর সব মেয়ের নাম তুমি জান কি না।

সব মেয়ের নাম কেউ জানে না। কিন্তু মাটি নাম যদি পৃথিবীর আর কোন মেয়ের না-ই থাকে, তাহলেই বা ও করবে কি? নিজের নাম রাখা তো নিজের হাতে নয়। নাম রেখেছিল ওর বাবা। কিন্তু তারও দোষ নয়। ছেলে-মেয়ে হলে হাতের কাছে যে নাম পায়, বাপ-মা রেখে বসে। ভাবে, সময় মত ধীরে-সুস্থে আর একটা জুতসই নাম রাখলেই চলবে।

ওর বাবাও হয় তো তাই ভেবেছিল। বর্ষার দিনে মাটির বস্তির ভিজে মাটির মেঝেয় জন্মাল মেয়ে। ঠাণ্ডার স্পর্শে জন্মমাত্র কুঁকড়ে সিটিয়ে গেল এক-রত্তি রক্তের ডেলা। মা-টাকে পেঁচোয় পেলে।

মাটি, মাটি, চারি দিকে ভিজে মাটি আর কাদা। নাম দেওয়া হল মাটি! তার পরে আর বদলাবার সময় পেলে না। হয়তো একটা জুতসই মিষ্টি পেশাকী নাম তার মনের মধ্যে ছিল। কিন্তু তাও কাউকে বলে যাবার সময় পেলে না। পরের বর্ষায় কি যে হল মা-বাপ দুজনেরই, কয়েক দিনের আগু-পিছু দুজনেই চোখ বুঁজলে, আর মেললে না। মাটি নামই রয়ে গেল।

তিন কুলে থাকবার মধ্যে ছিল এক মাসী। বোনের অসুখের খবর পেয়ে সে এসেছিল। এবং ওদের পর্ব চুকে গেলে, ওদেরই গালাগালি দিতে দিতে মেয়েকে কোলে করে নিজের কলকাতার বস্তিতে ফিরে এল।

গালাগালি দেবার কথাই তো। বোন-ভগিনীপতি যত দিন বেঁচে ছিল, কোন দিন ভালবেসে দিদিকে একখানা গামছা কিনে দেয় নি। আর আজকে তারই কোলে পুঁচকে একটা মেয়ে তুলে দিয়ে ড্যাং-ড্যাং করে চলে গেল। একবার ভাবলে না পর্যন্ত মাসী মেয়েটাকে মানুষ করবে কি দিয়ে!

গালাগালি দিলে। অনেক দিন পর্যন্ত যখনই কোন অসুবিধা হয়েছে তখনই দিয়েছে। তবু মেয়েটাকে নিয়েও এসেছে, নিজের সাধ্যমত মানুষও করেছে। শুধু নামটা বদলাবার প্রয়োজন সে-ও বোধ করে নি।

তা মাসী গালাগালি দিয়েছে বটে যখন-তখন, বলতে গেলে প্রায় সর্বক্ষণই, কিন্তু অযত্ন করে নি। খাইয়ে-পরিয়ে বড় করেছে। এখনও পর্যন্ত বাইরে খাটতেও দেয় নি। বয়স হয়েছে। তবু নিজেই পাঁচ বাড়ির ঝি-গিরি করে এনে খাইয়েছে বোনঝিকে। ইচ্ছা করলে তাকেও খাটাতে পারত, কিন্তু তা করে নি।

করে নি, তার অবশ্য অন্য কারণ ছিল। মাটিকে সুবিধা মতন ঘরে বিয়ে দিয়ে দেবার ইচ্ছা রয়েছে মাসীর। মাটি সুন্দরী মেয়ে নয়। কিন্তু তার মুখ, চোখ এবং অঙ্গসৌষ্ঠবে একটা চটক আছে। সুবিধা-মতন পাত্র সংগ্রহের ক্ষেত্রে সেটা তার মস্তবড় মূলধন। পাছে বাইরের দাসীবৃত্তি করলে সেই চটক নষ্ট হয়ে যায়, সেইটেই তার ভয়।

বস্তির অন্য স্ত্রীলোকেরা কিন্তু অন্য রকম সন্দেহ করত। মাসীর নিজের জীবনটা ভালো ভাবে কাটে নি! শেষ বয়সে উপায়ান্তর না দেখেই তাকে দাসী-বৃত্তি অবলম্বন করতে হয়েছে। অন্য স্ত্রীলোকের সন্দেহ, মাসী নিজের যৌবন যেমন ভাবে কাটিয়েছে, মাটিকে দিয়েও তাই করান তার অভিপ্রায়।

এ রকম সন্দেহের একটা কারণ, মাটিকে মাসী বেশ চটকের উপর রাখত—রঙিন শাড়ি, স্নো-পাউডার-সাবানের উপর। আর একটা কারণ, দু-একটি ভ্রমরের আসা-যাওয়া আরম্ভ হয়েছিল। সেটা মাসীর জ্ঞাতসারে, সেইটে তারা ঠিক ঠাহর করতে পারত না। তারা আসত, মাসী থাকে না সেই সময়।

তারা মানে, বটব্যালদের সেই বকাটে ছেলেটা আর ল্যাংড়া গণেশ।

হরেন বটব্যাল চটকদার ছেলে। সাজ-পোশাকে দুরন্ত। বাপের সঙ্গে কি একটা কারণে মনোমালিন্য হওয়ায় সে বাড়ি ছেড়ে অন্য জায়গায় থাকে। কি যে করে, কেউ সঠিক জানে না। হয় তো মোটরের কারখানায় মেকানিক, নয়তো ইলেকট্রিক মিস্ত্রি, নয়তো খবরের কাগজের হকার। কি হয়তো কোন সাইকেল-মেরামতের দোকানে কাজ করতেও পারে।

কিন্তু মাটির কাছে যখন আসে, তার পরনে থাকে কোঁচানো দিশী ধুতির উপর গিলে-করা পাঞ্জাবি, নয়তো পাম-বীচ স্যুট। চেহারাটাও, যাকে বলে স্মার্ট: ব্যাকব্রাশ-করা কোঁকড়ানো চুল, চঞ্চল চোখ, আর হাত নেড়ে কথা যখন কয় তখন আংটিগুলো ঝিলিক মারে। রং কালো।

তার তুলনায় গণেশের রং অনেকটা ফরসা। হরেনের মত লিকলিকে লম্বাও নয়। মাঝারি উচ্চতা, দোহারা গড়ন। সে শান্ত, ধীর, অনেকটা নিরীহ বলেই মনে হয়। চোখও চঞ্চল নয়, বরং করুণ। তাতে মা-মরা

ছেলের মত মাঝে মাঝে ধূর্ততা ঝিলিক মারে। আর একটা পা খোঁড়া। চলতে লাঠি দরকার হয়।

সেও যে কি করে, কেউ জানে না। হরেনের চাল-চলনে তার বৃত্তি সম্বন্ধে একটা অনুমান করা যায়, এর সম্বন্ধে তাও যায় না। তার মন্থর চলন—কিছুটা অবশ্য খোঁড়া পায়ের জন্যেও বটে—করুণ উদাস দৃষ্টি এবং জীর্ণ বেশ-বাস দেখে মনে হয়, কিছুই করে না হয়তো। ভবঘুরে, বাউণ্ডুলে।

হরেনের মত চটকদার ছেলের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে এখানে এসে সে জুটল কি সাহসে, সেইটেই আশ্চর্য! অথচ জুটেছে। এবং কেউ তাকে হঠাতে পারে না, কোন বিদ্রূপ, হাসি-টিটকারি তার এখানে আসা বন্ধ করতে পারে না। সে আসবেই।

মাসীর বাপের ছেলে ছিল না। দুটি মেয়ে। দক্ষিণে কোথায় তাদের বাড়ি, চব্বিশ পরগণা জেলায়। সেইখানে পিতৃত্যক্ত সামান্য কিছু জমির মালিক মাসী আর মাটির মা। তা মাটির মা তো মরেই গেছে। মাটিও মাসীর কাছেই মানুষ হচ্ছে। সুতরাং জমির মালিকানায় মাসী একেশ্বরী।

বছরে একবার, শীতকালে, ধান-ওঠার সময় মাসী দেশে যায়। ধান যা পায় তাও বিক্রি করে দিয়ে জমিদারের খাজনা মেটায়, জমি-জমা ভাগে বিলি-বন্দোবস্ত করে, আর বাকি টাকা—তা প্রায় শতখানেক হবে, নিয়ে আসে।

দিন পোনেরো লাগে।

মাটি যখন ছোট ছিল, তখন মাসী তাকেও সঙ্গে করে নিয়ে যেত। কিন্তু বড় হওয়ার পর, এখনও বিয়ে না দেওয়ার জন্যে গ্রামের লোকে ঠাট্টা করে, সমাজে কথা ওঠে, সেজন্যে কয়েক বৎসর থেকে আর তাকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছে না।

যাবার দরকারও হয় না। মাটি বড় হয়েছে, পরিচিত আবেষ্টনী, একলা থাকতে তারও ভয় হয় না, মাসীরও দুশ্চিন্তা হয় না।

এই সময়টায় হরেনের চূড়ামণি যোগ পড়ে যায়! বিকেলে প্রায়ই মোটর নিয়ে আসে। তার থেকেই মনে হয় মোটরের কারখানায় কাজ করে। আর সিনেমা, থিয়েটার, কার্নিভাল এবং হোটেলে খাওয়া-দাওয়ায় যে টাকা সে খরচ করে, শুনলে তাক লেগে যায়!

ল্যাংড়া গণেশ হাঁ করে শোনে। বলে, বলিস কি!

হাতের রুমালটা ঘুরিয়ে হাওয়া খেতে খেতে মাটি বলে, পঁচিশ টাকা

আজকে একটা সন্ধ্যেয় খরচ করলে, নিজের চোখে দেখলাম। এক-এক জায়গায় যায়, আর দশ টাকার নোট বার করে। পার তুমি ?

গণেশ যে পারে না তা জিজ্ঞাসা করে জানবার দরকার হয় না। তবু এর জন্যে সে লজ্জাও পায় না।

হা-হা করে নির্লজ্জ ভাবে হেসে জবাব দেয়। ওরে বাবা! আমাকে বেচলেও পঁচিশ টাকা পাওয়া যাবে না।

চোখ মটকে মাটি বলে, তবে আমার কাছে আস কেন ? তোমার সাহস তো কম নয় ?

গণেশ তথাপি দমে না। হাসতে হাসতেই বলে, ভালো লাগে তাই আসি। তোর কাছে আসতে ভয়েরই বা কি আছে, সাহসেরই বা কি আছে ?

—আছে বই কি ? হরেনের সঙ্গে পাল্লা দিতে হিম্মত চাই না ?

এবারে গণেশের চোখ কি রকম যেন হয়ে গেল। শান্ত কণ্ঠে জবাব দিলে, হরেনের সঙ্গে পাল্লা দিতে আমি চাই নে। তার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কি ? আমি আসি তোর জন্যে। তোকে দেখতে। তোর কাছে বসে দুদণ্ড কথা কইতে। আর কিছু নয়।

—তবে দেখ বসে বসে।

আঁচলে একটা ঝাপটা দিয়ে পোশাকী কাপড়টা ছাড়বার জন্যে মাটি ঘরের মধ্যে চলে গেল।

—শাড়িটা নতুন বলে মনে হচ্ছে ? হরেন দিলে বুঝি ?

ঘরের ভিতর থেকে মাটি উত্তর দিলে: তাছাড়া আর কে দেবে বল ? তোমার তো শুধু দেখতে আসা আর দুদণ্ড কথা কওয়া ?

তথাপি গণেশ লজ্জা পেলে বলে বোধ হল না।

জিজ্ঞাসা করলে, সিনেমা দেখতে গিয়েছিলি বুঝি ?

ঘরের ভিতর থেকেই উত্তর এল: আগে হোটেলে গিয়ে খেলাম। সেখান থেকে সিনেমায়। ভিতরে শাড়ির খস-খস শব্দে গণেশের সর্বাঙ্গে রোমাঞ্চ তরঙ্গিত হচ্ছিল। একটু খুশি, একটুখানি মিঠে আমেজ। কিন্তু ল্যাংড়া গণেশের কাছে সে এমন কিছু নয়।

তেমনি নির্লিপ্ত স্বরেই জিজ্ঞাসা করলে, আজ আর তাহলে রান্নার হাঙ্গাম নেই বল্। বাইরে থেকেই চুকিয়ে এসেছিস ?

একখানা আটপৌরে শাড়ি পরে মাটি হাসতে হাসতে বেরিয়ে এল এতক্ষণে। বললে, হ্যাঁ। কিন্তু হাঙ্গাম অদেষ্টে ছিল, কে খণ্ডাবে বল ?

—তার মানে ?

—তার মানে, ও যে আসবে, সিনেমায় নিয়ে যাবে জানতাম। কালকেই কথা হয়েছিল। খাওয়া-দাওয়াও রোজই হয়। কিন্তু পেট ভরে এমন করে খাওয়া হবে, কে জানত বল ?

—তাই বিকেলে রেঁধে রেখে গিয়েছিলি বুঝি ?

—হ্যাঁ।

—শীতের রাত, নষ্ট কিছুই হবে না। কাল খাবি এখন! কী বেঁধেছিলি ? তোর হাতের রান্না বড় মিষ্টি।

বলতে বলতে ল্যাংড়া জিভ দিয়ে নীচের ঠোঁটটা একবার চেটে নিলে।

উত্তর না দিয়ে মাটি এক মুহূর্ত কি যেন ভাবলে। জিজ্ঞাসা করলে, খাবে ? কি রেঁধেছি শোনার চেয়ে দেখে যাওয়াই ভালো।

—চেখে যাওয়া আরও ভালো। গণেশ হো-হো করে হেসে বললে—তাই দে। দুটো খেয়েই যাই।

লাঠিটা দরজার গোড়ায় ঠেসিয়ে রেখে আপন মনেই বললে, শালার খাওয়া ছেড়েই দিতে হয় বুঝি।

ভাত বাড়তে বাড়তে মাটি জিজ্ঞাসা করলে, কেন ?

ঘরের মধ্যে ঢুকে গণেশ বললে, না তো কি বল্ ? যেদিন যে হোটেলে পাই, ঢুকে পড়ি। তা সব জায়গায় এক অবস্থা!

—ভালো রাঁধে না বুঝি ?

—তোকে একদিন খাওয়াব। খেলে বুঝবি ?

খাওয়ানর কথায় মাটি খিলখিল করে হেসে উঠল : আর খাওয়াতে হবে না। মুরোদ যত জানা গেছে। মুখেই বল, শুনি।

—মুখে আর বলব কত মাটি! মুখে বলার ব্যাপার নয়। তেল দেবে না, মসলা দেবে না, খালি ঝাল দেবে। বিষের মত ঝাল! মুখে দেয় কার বাপের সাধ্যি! পেট ক্ষিদেয় জ্বলছে। কিন্তু এক গেরাস মুখে দিয়ে উঠে পড়লাম।

—আহা রে! খাওয়া হয় নি তা হলে ?

—কি করে হবে ? এমন কত দিন হয়েছে।

গণেশ নিবিষ্ট চিত্তে খেতে লাগল। সমস্ত দিনের পরে খাওয়া। গণেশ কোন দিকে চায় না। শুধু বড় বড় গ্রাস তোলে আর মুখের মধ্যে পুরে দেয়। দেখতে দেখতে মাটির মুখখানা কোমল হয়ে এল।

বললে, হোটেলে খেতে যখন পার না, তখন নিজে রেঁধে খাও না কেন?

গণেশের কথা বলার সময় নেই। খাওয়ার বম্বে মেল চলেছে। কোন মতে বললে, সময় কোথা?

—কেন? এত কী তোমার কাজ যে, ভাতে-ভাত দুটো ফুটিয়ে নেবারও সময় নেই?

—অনেক কাজ, অনেক কাজ। সে তুই বুঝবি নে। এতক্ষণে গণেশ মুখ তুলে চাইলে—হাঁড়িতে আর ভাত আছে না কি?

—আছে বই কি!

এক হাতা ভাত দিয়ে মাটি জিজ্ঞাসা করলে, আর দুটো দিই?

—না, থাক।

খাওয়া শেষ করে গণেশ হাতটা চাটতে লাগল। বললে, তোর রান্না বড় মিষ্টি। বেশ রাঁধিস।

—আচ্ছা, হয়েছে। আর খোসামোদ করতে হবে না।

মাটি ঘটিতে করে জল দিলে।

মুখ ধুয়ে এসে গণেশ পান খেলে। জিজ্ঞেস করলে, জর্দা নেই?

হুঁ! শখটুকু আছে!

মাটি ভিতর থেকে জর্দার কৌটা এনে দিলে।

দাওয়ায় বসে মৌজ করে পান চিবুতে চিবুতে গণেশ বললে, পাই বলেই শখটুকু আছে। তা হলে তোকে বলি শোন, হরেনকে আমি হিংসে করি নে।

—হিংসে করে কি করবে? তাতে আর তোমাতে! আসমান-জমিন ফারাক। তীক্ষ্ণকণ্ঠে মাটি বললে।

কিন্তু গণেশ শান্ত কণ্ঠেই উত্তর দিলে: স্বীকার করলাম সে বড় লোক। কিন্তু তোর কাছ থেকে আমি যা পাই, সে পায় না।

ওর কথায় মাটি খিলখিল করে হেসে উঠল: সে যা পায়, তুমি তার কানাকড়িও পাও না।

—তা নয় ঠিক।

—বল তুমি কি পাও?

গণেশ গম্ভীর ভাবে হেসে বললে, এই সামনে বসে আমাকে কত যত্ন করে খাওয়ালি, এ পায় সে?

ওর কথা শুনে মাটির হাসি আর বাঁধন মানলে না। বললে, ছিঃ ছিঃ! এই পাওনা! তুমি নিতান্ত বেহায়া, তাই এমন কাঙালের মত আস-যাও, ছিঃ ছিঃ!

কিন্তু এত বড় ধিক্কারেও গণেশের মুখের কোন ব্যতিক্রম দেখা গেল না। হাসতে হাসতেই বললে, আচ্ছা! রাত হয়েছে, উঠি এখন। আবার একদিন আসব। হরেনের জন্যে তোর তো এখন অবসর নেই।

বলে উঠে চলে গেল।

বিকেলে হরেন এল।

তার পরনে ইংরিজী পোশাক: কর্ডের ট্রাউজার এবং সার্জের কোট; তার বাটন-হোলে একটা গোলাপফুল।

ব্যস্ত ভাবে ঢুকেই জিজ্ঞাসা করলে, এখনও তৈরী হয়ে নাও নি?

মাটির চুলবাঁধা, গা ধোয়া হয়ে গিয়েছিল। বললে, এই যে হয়ে গেছে।

হরেন উঠোনেই ছটফট করতে করতে পায়চারি করতে লাগল। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই মাটি চটি পায়ে দিয়ে বেরিয়ে এল।

—চল।

বাইরে মোটর দাঁড়িয়ে ছিল। ড্রাইভার হরেন নিজেই। মাটি তার পাশে গিয়ে বসল। তার মুখে বেশ একটা উৎফুল্ল গাম্ভীর্য। দিন তিনেক হল হরেনের দৌলতে রোজ সে মোটর চড়ছে। এর মধ্যে যেন সে মোটর চড়ায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। যেন কত কাল থেকে চড়ছে। যেন আজীবন মোটরেই সে চড়ে এসেছে। তার বসা, তার চাউনি দেখলে তাই মনে হয়। মেয়েরা যে কোনো অবস্থায় এমন সহজেই অভ্যস্ত হয়ে যায়।

মোটর তৎক্ষণাৎ চলতে আরম্ভ করলে। ওদের বস্তির ক্ষান্ত একটা ঠোঙায় করে কি নিয়ে আসছিল, ওকে মোটরে দেখে সে থমকে দাঁড়িয়ে গেল। অন্যমনস্ক ভাবে আসছিল ব্যাঙা। তারও হাতে ময়দার ঠোঙা। আচমকা হর্নের শব্দে ছেলেমানুষ এমনই চমকে উঠল যে, হাতের ঠোঙা মাটিতে পড়ে গেল। মোটরের আরোহিণীর দিকে চেয়ে সেটা তুলতে পর্যন্ত ভুলে গেল।

হ্যাঁ। একটি সুবেশ যুবকের সঙ্গে মোটর-গাড়ি চড়ে তাদেরই বস্তির একটি মেয়ে, মাটি—পিতৃমাতৃহীন অনাথিনী, যে মাসীর দয়ায় মানুষ হচ্ছে সেই মেয়ে, তাদের চোখের সামনে দিয়ে ভোঁ করে বেরিয়ে চলে গেল!

একটা দেখবার মত ব্যাপার নিশ্চয়ই। তারা হাঁ করে চেয়ে দেখলে। দেখে থ মেরে গেল।

দেখলে মাটিও। দেখলে ক্ষান্তকে এবং ব্যাঙাকেও। কিন্তু হাঁ করে নয়,

বাহুত অত্যন্ত নিস্পৃহ ভাবে, অপাঙ্গে। দেখে তার সমস্ত শরীরে গর্বের এবং গৌরবের একটা শিহরণ খেলে গেল।

ডান দিকে অপাঙ্গে চাইলে: অত্যন্ত কাছে হরেন। তাকে ভালো দেখা গেল না। চোখে পড়ল তার দুটো হাত স্টিয়ারিঙের উপর কত হেলাফেলা করে, অথচ কত দৃঢ়ভাবে রয়েছে। হরেন, কত কাছে। অথচ ওকে যেন অস্পষ্ট দেখাচ্ছে। সমস্ত চেহারাটাই শীতের বিকেলে কেমন অস্পষ্ট দেখাচ্ছে। এমন কি, ওর মূল্যবান ইংরিজী পোশাকও।

শুধু জলজল করছে ওর বাটন্‌হোলের গোলাপটা। রক্তের মত লাল। যেন খুশিতে জলছে।

মুহূর্তে মনে পড়ল ওর নিচু বস্তিটাকে। যেন একটা অতিকায় কেন্নুই। অনেকগুলো মানুষের উপর গুঁড়ি মেরে চেপে রয়েছে। তার উপরও। খোলার চাল এত নিচু যে, উঠোন থেকে দাওয়ায় উঠতে মাথায় ঠেকে। বিবর্ণ মলিন দেয়ালগুলো যেন পিষে মারতে চায়।

হঠাৎ মাটির মনে হল, দেওয়ালগুলো যেন সরে যাচ্ছে। দূরে, ক্রমেই আরও দূরে। মাথার উপরের খোলার চাল যেন ক্রমেই আরও উপরে উঠেছে। আকাশের দিকে। একেবারে আকাশে।

তার পরিসর যেন বাড়ছে। ডাইনে-বাঁয়ে, মাথার 'পরে অপরিমেয় আকাশ ছাড়া আর কিছু নেই।

গাড়ি থামল গঙ্গার ধারে, গড়ের মাঠের একান্তে।

—নাম।

নামবে? কোথায়? চারি দিকে যেখানে আকাশ, শুধু আকাশ—সেখানে নামবে কোথায়? সেখানে কি পায়ের তলায় মাটি আছে? শুধু তো হাওয়া। এবং সেই হাওয়ায় পালকের মত সে ভাসছে। ভেসে চলেছে। কোথায়, তাই বা কে জানে?

তবু মাটি যন্ত্রচালিতের মত নামল।

সন্ধ্যা নেমেছে। তার সঙ্গে একটা স্তব্ধতা। কোমল, রেশমের মত কোমল স্তব্ধতা।

একটা অন্ধকার গাছতলায় বেঞ্চের উপর দুজনে বসল। হরেন বাঁ হাত দিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরলে। মাটি সাড়া দিলে না। হয়তো বুঝতেই পারলে না। তার মনে হল, হরেন জড়িয়ে ধরেছে বটে, কিন্তু তাকে নয়, বুঝি অন্য কাউকে।

চুপি চুপি হরেন বলে, আজ বাড়ি ফিরতে রাত হবে। অসুবিধা হবে না তো কিছু?

মাটি ঘাড় নেড়ে জনালে, না।

হরেন বললে, এখান থেকে যাব হোটেলে।

—সেখান থেকে?

—কার্নিভালে।

অকস্মাৎ একটা প্রচণ্ড আনন্দে মাটি তীক্ষ্ণ কণ্ঠে উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠল।

সে-হাসিতে হরেন চমকে উঠল: কি হল?

কি যে হয়েছে, মাটিও তা জানে না। তার মনের মধ্যে যত হাল্‌কা হাওয়া জমছিল, অকস্মাৎ একটা দমকায় তা যেন বারুদের মত ফেটে বেরিয়ে গেল।

মুখে বললে, না, কিছু হয় নি। চল হোটেলে। সেখান থেকে কার্নিভালে। তার পরে? তার পরে কোথায়?

হরেন হেসে বললে, তার পরে আর কোথায়? তার পরে বাড়ি।

—বাড়ি!

মাটির মুখ মলিন হয়ে উঠল। তার পরে আর নেই? বাড়ি? সেই বাড়ি, যেখানে খোলার চাল প্রায় আভূমিপ্রণত, বাতায়নহীন দেওয়ালে কিসের যেন একটা ভাপসা গন্ধ? ঘুরে-ফিরে আবার সেইখানে?

মাথা নেড়ে বললে, না।

ওর ছেলেমানুষী জেনে হরেন হেসে উঠল: আর কোথায় যাবে বল?

—যেখানে খুশি।

হরেন বোঝাতে লাগল: কার্নিভাল এগারোটায় শেষ হয়ে যাবে। ঠিক জানি না, হয়তো বড় জোর বারোটা পর্যন্ত। তার পরে আর কোথাও যাবার নেই।

—কোথাও যাবার নেই? বাজে কথা! এর নাম কলকাতা শহর। নিশ্চয়ই আরও অনেক জায়গায় যাবার আছে।

ওর অজ্ঞতায় হরেন হেসে ফেললে: কোথাও যাবার নেই। সিনেমা-থিয়েটার সমস্তই বন্ধ হয়ে যাবে তার মধ্যে।

—যদি আমরা সারা রাত পথে পথে ঘুরি?

—পুলিসের হাতে পড়ব। থানায় গিয়ে রাত কাটাতে হবে।

পুলিসের নামে মাটি দমে গেল: পুলিসের হাতে কেন?

—পথে পথে ঘুরতে গেলে তাই পড়তে হবে।

না। পুলিসের হাতে পড়তে মাটির ইচ্ছা নেই। পুলিসকে ছেলেবেলা থেকেই তার বড় ভয়।

তবু শেষ চেষ্টা হিসাবে বললে, আর কোন জায়গাই নেই তাহলে?

হরেন মুখ টিপে একটু অদ্ভুত রকমে হাসলে। বললে, আছে। কিন্তু সেখানে তোমাকে নিয়ে যেতে চাই নে।

—কেন?

—জায়গাটা ভালো নয়।

জায়গাটা কোথায়, বোঝবার মত বয়স মাটির হয়েছে। বুঝতে তার পরেও যদি কিছু অসুবিধা ছিল, হরেনের চোখের হাসিতে তাও আর রইল না। এবং বোঝামাত্রই ভয়ে তার সমস্ত শরীর শিউরে উঠল।

ভয়ে ভয়ে বললে, তাহলে বাড়িই ফিরে যাই চল।

—হোটেলে যাবে না?

—না।

—কার্নিভালে?

—অন্য এক দিন। আমাকে বাড়ি পৌঁছে দাও।

বিস্মিত ভাবে হরেন বললে, এইমাত্র বাড়ি ফিরতে চাইছিলে না। আর এখনই বাড়ি ফেরার তাড়া! কি হল তোমার?

মাটি কুণ্ঠিত ভাবে স্বীকার করলে, ভয় করছে।

—ভয় কিসের?

—তা জানি নে।

—পাগল আর কি!

হরেন ছাড়বে কেন? অনেক আনন্দের সংকল্প নিয়ে সে বেরিয়েছে। এত শীঘ্র সে ফিরতে পারে না। মাটিকে এক রকম জোর করেই সে নিয়ে চলল প্রথমে হোটেলে, তারপর কার্নিভালে। সেখানে বাইরে আলোর মেলা, ভিতরে আনন্দের। সার্কাস, নাগরদোলা, আরও কত তাজ্জব ব্যাপার! গভীর রাত্রে মাটিকে যখন সে বাড়ি পৌঁছে দিলে, তখন মাটির সমস্ত দেহ অবশ হয়ে গেছে। মাথার ভিতর সমস্ত ঝিঁঝি পোকা ডাকছে। টলতে টলতে ঘরে ঢুকেই বিছানায় শুয়ে পড়ল।

দুই

সন্ধ্যার পরে গণেশ একবার মাটির খোঁজ নিতে এসেছিল। তখন রাত ন-টা হবে। তখনও ওরা ফেরে নি।

ওকে দেখে হেসেছিল বস্তির মেয়েরা। আড়-ঘোমটার আড়াল থেকে ওকে শুনিয়ে শুনিয়ে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করেছিল :

খোঁড়াটা কি আনন্দে আসে!

ও এখনও হাল ছাড়ে নি। সহজে ছাড়বেও না।

ও কি ভাবছে এখনও ওর আশা আছে? কি ভরসায় ভাবে? মাটি কি আর সেই মাটি আছে? এখন সে মোটর চড়ে হাওয়া খেতে বেরুচ্ছে।

ভরসা আছে বই কি! ওর ওই ল্যাংড়া পায়ের ভরসা!

ওর ভরসাও নয়, কিছুই নয়।

তবে?

ও আসে খেতে। যেদিন আসে, একপেট খেয়ে যায়!

তা মন্দ নয়। ল্যাংড়ার বুদ্ধি আছে। সে খাওয়ায়, আর ও খায়!

গণেশ শুনলে ওদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ। না শুনে উপায় কি! ওরা তো এক-রকম তার কানের কাছেই বলছে। কিন্তু না-শোনার ভান করেই চলে গেল। বুঝে গেল, সন্ধ্যার দিকে এসে লাভ নেই।

সুতরাং পরের দিন সকাল বেলাতেই এল।

মাটির ঘুম সম্ভবত একটু আগেই ভেঙেছে। চোখ থেকে তখনও ঘোর কাটে নি। একটা খুঁটিতে ঠেস দিয়ে অলস ভাবে দাওয়ায় বসে।

গণেশের পায়ের শব্দে সে একবার চোখ মেলে চেয়েই আবার তাচ্ছিল্য ভরে চোখ বন্ধ করলে।

কিন্তু গণেশ তাতে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হল না।

হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করলে, কাল কখন ফিরলি?

চোখ বন্ধ করে তেমনি উপেক্ষাভরেই মাটি জবাব দিলে, তা শুনে তোমার লাভ কি?

অদূরে অনাবৃত মেঝের উপরই গণেশ হাতের লাঠিটা এক পাশে ঠেস দিয়ে রেখে আরাম করে বসল।

বললে, লাভ আবার কি? কাল সন্ধ্যেয় এসেছিলাম। তখনও তুই ফিরিস নি। তাই জিগ্যেস করলাম। এই উঠলি বুঝি?

অনাবশ্যক বোধে মাটি আর এর জবাব দিলে না।

এবারে গণেশ বললে যেন আপন মনে, রাত্তিরে ঘুম না হলে শরীর ভারি ম্যাজম্যাজ করে। একটু চা খা। খেয়ে চান করে যা হোক দুটো ফুটিয়ে লম্বা একটা ঘুম দে। ব্যস

মাটি তথাপি সাড়া দিলে না।

ওর অবস্থা দেখে গণেশ হাসলে। জোরে জোরে বললে, কাচের গেলাসটা কোথা?

—কেন?

—তা শুনে কি করবি? কোথা আছে বল না।

—দেখ, ঘরের ভেতরেই কোথাও আছে।

অন্ধকার ঘর। কোন কিছু খুঁজে পাওয়া সহজ নয়। কিন্তু গণেশের কাছে ঘরটা একেবারে অপরিচিত নয়। তক্তাপোশের নীচেই পাওয়া গেল। সেটা নিয়ে সে বেরিয়ে গেল। এবং কিছু পরেই ভর্তি এক গ্লাস চা নিয়ে ফিরল।

জিজ্ঞাসা করলে, একটা হাতল-ভাঙা কাপ ছিল না?

—কি হবে?

এবার গণেশ রেগে গেল। ঝাঁজের সঙ্গে বললে, কেন, কি হবে—তুই চোখ মেলে না চাইলে কি করে বোঝাই বল দিকি?

মাটি চোখ মেলে চেয়ে দেখে, গণেশের হাতে ভর্তি এক গ্লাস চা। দুজনে ভাগ করে খাবার জন্যে আর একটা কাপ দরকার। মাটির একটুখানি চায়েরই আবশ্যক ছিল। আলস্যবশত সে নিজে করে উঠতে পারছিল না। সুতরাং এখনও পর্যন্ত চা পেটে পড়ে নি।

ধীরে ধীরে তার মুখে খুশির আমেজ ফুটতে লাগল। ভিতর থেকে একটা কাপ নিয়ে এসে গ্লাসের চা-টা ভাগ করে, কাপটা গণেশকে দিয়ে গ্লাসটা নিজে নিলে।

দু-একটা চুমুক দিতেই মাটির শরীরটা একটু চাঙ্গা হল। গ্লাসের আড়ে আড়ে গণেশের দিকে চেয়ে মিটিমিটি হাসতে লাগল।

—হাসছিস কেন?

তেমনি মিটিমিটি হাসতে হাসতেই মাটি বললে, যেমন দয়া করে চা খাওয়ালে, তেমনি দয়া করে যদি বাজারটাও করে এনে দিতে?

এ রকম একটা প্রস্তাবে গণেশ মোটেই বিস্মিত হল না। বরং মনে হল, এরই যেন সে প্রতীক্ষা করছিল।

তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়ে ডান হাতটা বাড়িয়ে দিলে: তাহলে তাড়াতাড়ি পয়সা দে। আমাকে আবার অন্য জায়গায় যেতে হবে।

কৌতুকে মাটির চোখ দুটো খঞ্জন পাখির মত নেচে উঠল: পয়সা! আমি পয়সা কোথা পাব?

—আচ্ছা বেশ। বাজারের থলিটা দিবি তো?

—ওই ঘরের ভেতরে আছে। নিয়ে যাও।

—ধন্যি মেয়ে বাবা! বলে গণেশ ভিতরে গেল।

—ওই বাঁ দিকের দেয়ালে ঝুলছে দেখ। বাঁ দিকের দেয়ালের কাছে এসে গণেশ থমকে গেল। প্রথম বার সে অতটা খেয়াল করে নি। দেখলে, এক পাশে মাটির গত রাত্রের ছাড়া শাড়ি-ব্লাউস পড়ে আছে। বোধ হয় এত ক্লান্ত হয়ে ফিরেছিল যে, সেগুলো গুছিয়ে ভাঁজ করে তুলে রাখতেও পারে নি। তা থেকে ভুরভুর করে এখনও একটা সস্তা উগ্র এসেন্সের গন্ধ বেরুচ্ছে!

বাজারের থলিটা হাতে নিয়ে গণেশ নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল।

বাজার থেকে ফিরে এসে দেখলে, মাটির স্নান হয়ে গেছে। এলো চুল পিঠের কাছে গেরো দিয়ে বাঁধা। উনোনে চায়ের জল চড়েছে।

গণেশ সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলে, আবার চা কেন?

—তখন ঠিক জুত হয় নি। হাসতে হাসতে উঠে মাটি জিজ্ঞাসা করলে, কই, কি বাজার আনলে দেখি?

বিরক্ত ভাবে গণেশ বললে, গেরস্ত ঘরের মেয়ে, হিসেব মত খরচ করতে হয়। লক্ষীছাড়ার মত খরচ করা আমার দু-চক্ষের বিষ।

মাটি রাগ করলে না। হাসতে হাসতে বললে, আচ্ছা, আচ্ছা। থলিটা ঝাড়। কি এনেছ দেখি?

মাটির অমিতব্যয়িতায় তখনও গণেশের ক্রোধ শান্ত হয় নি। সে থলিটা ঝাড়তে ঝাড়তে বলতে লাগল: এ সব হরেনের সঙ্গে মিশে হয়েছে। বাউণ্ডুলে লক্ষীছাড়া স্বভাব!

কিন্তু বাজারের পরিমাণ দেখে মাটি গালে হাত দিয়ে বললে, বুঝলাম, আমি বাউণ্ডুলে লক্ষীছাড়া। হরেনের সঙ্গে মিশে হয়েছে। কিন্তু তুমি এ করেছ কি—ফুলকপি, বাঁধাকপি, গলদা চিংড়ি, ভেটকি মাছ—এ সব কার সঙ্গে মিশে হয়েছে?

গণেশ হেসে ফেললে। বললে, আমি এ সব কিনেছি তোকে খাওয়াবার জন্যে। তুই চা চড়িয়েছিস কার জন্যে?

—কেন, তোমার জন্যে।

—আচ্ছা, তাহলে ঠিক আছে। একটু তেল দে তো।

—তেল!

—হাঁ, হাঁ। সর্ষের তেল। তোর চা হতে হতে চানটা সেরে আসি। তারপরে—

—তার পরে ?

—তার পরে রান্না চড়াব! গণেশ চোখে একটা অদ্ভুত ভঙ্গী করলে।

—ঠাট্টা করছ ?

—না, সত্যি। রোজ রোজ তোর রান্না খাই! আজ একবার আমার রান্না খেয়ে দেখ, চলবে কি না। এর মধ্যে মাছগুলো বেছে ফেল।

মাটি তেল এনে দিলে। কিন্তু তখনও বিশ্বাস করতে পারছে না গণেশ সত্যি বলছে, না পরিহাস করছে।

জিজ্ঞাসা করলে, আর তরকারি কি তুমি কুটবে ?

—না। ওটা তুই করবি।

বলেই গণেশ কলতলায় ছুটল। স্নানান্তে ফিরে এসে বললে, ভুলে কাপড়টা কেচে ফেললাম। এখন পরি কি ?

মাটির ভারি আমোদ বোধ হল। একটা কটাক্ষ হেনে বললে, আমার শাড়ি পরবে ?

শাড়ি ? একটু কিন্তু করে বললে, তাই দে।

একখানা গাঢ় রঙের জমকালো শাড়ি এনে দিলে মাটি। তাই পরে সত্য সত্যই রাঁধতে বসে গেল। প্রতিবেশিনীরা আড়াল থেকে দেখে হেসেই অস্থির।

সেদিকে ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করে মাটি বললে, ওরা হাসছে। তুমি সর, আমি রাঁধছি।

গণেশ সরলে না। হাসতে হাসতে বললে, হাসুক। তরকারি যথেষ্ট আছে। সব ঘরে একটু একটু দিয়ে আসবি। খেয়ে দেখলে তখন স্বীকার করবে, গণেশ বাবু রাঁধতে জানে!

গণেশ বাবুর অহংকার যে শূন্যগর্ভ নয়, তা স্বীকার করবার জন্যে অবশ্য প্রতিবেশিনীদের খাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হল। কিন্তু মাটিকে নয়। ওর রান্না করবার ভঙ্গী দেখেই সে বুঝে নিলে, গণেশ পাকা রাঁধিয়ে। খাওয়ার সময় সেই অনুমান প্রত্যয়ে পরিণত হল।

মাটির লজ্জা-ভয়-সঙ্কোচ সব কিছু মাসীকে। অথবা মাসীকেও ঠিক নয়, তার মুখকে। মাসী যখন মুখ খোলে, তখন ঊর্ধ্বতন চতুর্দশ পুরুষকে উদ্ধার

করে ছাড়ে এবং এমন ভাষা প্রয়োগ করে যে, মাটিকে মাটির সঙ্গে মিশে যেতে হয়!

যা ভয় তাকেই। নইলে এ বস্তির আর কাউকেও সে ভয় করে না, ভয় করবার কারণও নেই। বরং তাদের কাছ থেকে নানা বিষয়ে প্রশ্রয় পায়। সুতরাং ভাত বেড়ে নিয়ে ওরা দুজনে পাশাপাশি খেতে বসল।

ফুলকপি দিয়ে চিংড়ি মাছটা মুখে দিয়ে মাটিকে বলতে হল, এমন রান্না তুমি কোত্থেকে শিখলে গো?

গর্বের সঙ্গে গণেশ বললে, সে শুনে তুই কি করবি? দু-চারটে রান্না শিখবি আমার কাছে?

—শিখব।

—কিন্তু হরেন যদি রাগ করে?

গণেশ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে চেয়ে রইল, কি উত্তর দেয় শোনবার জন্যে।

মুহূর্তের জন্যে মাটি থতমত খেয়ে গেল। মুহুর্মুহু কয়েকবারই তার মুখে রক্ত এল আর ফিরে গেল।

বললে, সে জানবে কি করে?

—যদি জেনে ফেলে? এই বস্তির কেউ বলে দেয়, কিংবা নিজেই একদিন হঠাৎ এসে দেখে ফেলে?

মাটি নতমুখে স্বীকার করলে, তাহলে শেখা বন্ধ হবে।

গণেশ নিঃশব্দে গম্ভীর মুখে কিছুক্ষণ খেয়ে যেতে লাগল।

তার পর বললে, তার সাজ-পোশাক মোটরগাড়ি দেখে তোর খুব তাক লেগে গেছে, না রে?

—তা লেগেছে বই কি।

গণেশ হেসে বললে, আসলে সে কিন্তু বড়লোক নয়।

অবিশ্বাসের ভঙ্গীতে মাটি বললে, নয় যদি তা হলে রোজ রোজ অত খরচ করে? খরচের বহর যদি দেখ তাহলে তোমারও তাক লেগে যাবে!

উপেক্ষাভরে হেসে গণেশ বললে, আমার তাক লাগবে না। আমি জানি যে।

—কি জান?

মাটির কণ্ঠে ক্রোধের আভাস।

কিন্তু সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করেই গণেশ জবাব দিলে যে, ও দেনা করে নবাবী করে।

এবারে মাটি রীতিমত রেগে গেল। বললে, তুমি ওর হিংসে কর, তাই ও রকম বলছ।

নির্বিকার চিত্তে গণেশ বললে, হিংসে করতে পারি। কিন্তু হিংসে করি বলেই বানিয়ে মিথ্যে বলছি না। খবর নিয়েছি, তাই জানি। তুই যদি প্রমাণ চাস :

—না, আমি প্রমাণ চাই নে। তুমি থাম।

গণেশ আর কিছু বললে না। আহারান্তে সুগন্ধি জর্দাসহ দু-খিলি পান মুখে দিয়ে বললে, খাওয়াটা বড় বেশি হয়ে গেছে। একটু শুতে পেলে ভালো হত। কিন্তু বাধা দিয়ে মাটি বললে, না, না। শোয়া-টোয়া হবে না। বাড়ি গিয়ে শোও গে বরং।

হেসে গণেশ বললে, তাই তো বলছিলাম রে! শোয়ার সুবিধে নেই। এখনই হরেনবাবু এসে পড়তে পারে। নয়!

মাটি ঘাড় নেড়ে নিঃশব্দে জানালে, সে সম্ভাবনা রয়েছে।

—আজও কি গাড়ি নিয়ে আসবে?

—আসতে পারে।

—তাই কি হয় বোকা! পরের গাড়ি কি রোজ রোজ আনা যায়?

—পরের গাড়ি কি করে জানলে?

—জানি। যে-কারখানায় ও কাজ করে, সেই কারখানার মেরামতি গাড়ি নিয়ে এক-আধদিন বেরোয়।

ওর কথাগুলো মাটির খুব খারাপ লাগছিল। এবং এ-সবের মূল যে হিংসা তাতেও তার সন্দেহ ছিল না।

বললে, আচ্ছা সে গাড়ি যারই হোক, সে নিজে এসে পড়বে এখনই। তুমি ওঠ।

—হ্যাঁ, উঠি। আর একটা পান দে দেখি, জর্দা দিয়ে।

ওকে তাড়াবার জন্যে মাটি ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। ওকে বিদায় করে সে গা ধোবে। তাকে কাপড় পরে একেবারে তৈরী হয়ে থাকতে হবে। হরেন যেন ঘোড়ায় জিন দিয়ে আসে। এক মিনিট দেরি করতে চায় না।

তাড়াতাড়ি ওকে পান-জর্দা দিয়ে বললে, আচ্ছা। আর দেরি করো না। ওঠ এইবার।

পান জর্দা মুখে দিয়ে গণেশ লাঠিটা তুলে নিলে। বললে, দুপুরটা বেশ কাটল, নয়?

অন্যমনস্ক ভাবে মাটি বললে, মন্দ কি!

আর কিছুই বলার নেই। গণেশ লাঠি ঠুকতে ঠুকতে ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল

তিন

এর পরে বছর দুই কেটে গেল।

মাটির কাছে গণেশ এবং হরেন দুজনেরই আসা-যাওয়া যেমন চলছিল তেমনি চলেছে। এখন আর আগের মত মাসীর চোখে ধুলো দিয়ে চলতে হয় না। আড়ালটা রেখেছে। কিন্তু মাসীর সামনে পড়ে গেলে এখন আর থতমত খেতে হয় না। মাসী নিজেই সরে যায়। ওদের ব্যাপারটা সে জানে না তো জানেই না, এই ভানটা রেখেছে।

যেদিন মাটির ফিরতে দেরি হয়, মাসী গ্রাহ্য করে না। কার সঙ্গে কোথায় গিয়েছিল, কেন এত রাত্রি হল জিজ্ঞাসা করারও আবশ্যক বোধ করে না। যেন কিছুই হয় নি, মাটি এতক্ষণ পাশের ঘরের ওরই সমবয়সী বউটির সঙ্গে গল্প করছিল—এই রকমই ভাব দেখায়।

শরীরও তার ভালো দেখা যাচ্ছে না তেমন। মাঝে মাঝেই জ্বরে ভোগে। দু-চার দিন উপোস দিয়ে আবার সেরে ওঠে, আবার কাজে বেরিয়ে যায়। দেহ আর বইছে না, তবু মাটিকে কাজ করতে দেয় না। নিজেই অতগুলো বাড়ির কাজ করে। পারে না, তবু করে।

মাঝে মাঝে তাকে চিন্তিতও বোধ হয়। যখন মাটি থাকে না, হরেনের সঙ্গে কোথাও বেড়াতে যায়, কিংবা পাশের কোন ঘরে বসে গল্প করে, তখন অন্ধকার দাওয়ায় খুঁটিতে ঠেস দিয়ে সে আপন মনে কি যেন ভাবে। অন্ধকারে তার মুখ দেখা যায় না। দেখা গেলে বোঝা যেত, তার মুখ অন্ধকার, লোল ললাটে দুশ্চিন্তার রেখা।

অনেক দিন পরে একদিন এই দুশ্চিন্তার কথাটা নিজে থেকেই সে পাড়লে।

সেদিন মাটির ফিরতে বেশ রাত হয়েছিল। ছ-টার শোতে হরেন ওকে একটা সিনেমায় নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বইটা ভাল হয় নি। ওদের মন ভরে নি। কিন্তু কি আর করা যাবে? অতৃপ্ত মন নিয়েই বাড়ি ফিরছিল। পথে আর একটা সিনেমা-গৃহের সামনে এসে হরেন দাঁড়িয়ে পড়ল।

—কি—কি হল?

—এই বইটা দেখবার জন্তে চেষ্টা করেছিলাম। ছ-টার শোয়ে টিকিট পাই নি। দাঁড়াও, দেখি এখন টিকিট পাওয়া যায় কি না।

এত রাত্রে বেশি লোক সিনেমায় আসে না। পাওয়া গেল দু-খানা টিকিট। ওরা ঢুকে পড়ল।

বাড়ি ফিরল তখন প্রায় বারোটা বাজে।

মাটি বাড়িতে ঢুকে দেখলে, দাওয়ায় মাসী বসে নেই। ও যখন ফেরে—রাত বেশিই হোক আর কমই হোক—মাসী নিঃশব্দে এইখানটায় মাটির জন্তে বসে থাকে।

কি হল? মাসী আবার কোথায় গেল?

ঘরের মধ্যে মিটমিট করে হারিকেন জলছে। ঘরে ঢুকে সেটাকে উসকে দিতেই দেখা গেল, মাসী পিছন ফিরে শুয়ে।

মাসী কি রাগ করেছে না কি?

ভয়ে ভয়ে ডাকলে, মাসি!

বার দুই ডাকতে মাসী পাশ ফিরলে: মাটি!

যাক। বাঁচা গেল। মাসীর কণ্ঠস্বর অস্বাভাবিক রকম কোমল এবং স্নিগ্ধ। রাগ করে নি তা হলে।

মাটি বাইরে যাবার কাপড় সযত্নে আলনায় তুলে রেখে বাইরে থেকে হাত-পা-মুখ ধুয়ে এল।

মাসী শুয়ে। মনে হল অঘোরে ঘুমুচ্ছে। অন্ত দিনে মাটি ফিরলে মাসী নিজেই দু-থালা ভাত বাড়ে। পাশাপাশি বসে খায়। থালা-বাসনগুলোয় মাটি মাসীকে আর হাত দিতে দেয় না। নিজেই মেজে নিয়ে আসে। আজ মাসীর ভাত বাড়ার চাড় নেই কেন?

—ভাত বাড়ি মাসী?

—আমি আজ আর খাব না মাটি! তুই নিজের জন্তে বাড় শুধু।

—কেন? কি হল?

—শরীরটা ভালো নয়। রাত্রে কিছু খাব না।

গায়ে হাত দিয়ে মাটি দেখলে, শরীর শুধু ভালো নেই নয়, রীতিমত জর।

মাটি বললে, তোমার যে বেশ জর মাসী! মিছেমিছি আমার জন্তে কষ্ট করে রাঁধলে কেন? দুটো মুড়ি-টুড়ি কিছু খেতাম।

মাসী বললে, এত রাত্রে এসে মুড়ি চিবুতে ভালো লাগবে কেন? তাই মরতে মরতেও দুটো ভাতে-ভাত নামিয়ে রেখেছি তোর জন্তে।

আহারান্তে মাটি বললে, তোমার গায়ে-মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দিই মাসী ?

বাধা দিয়ে মাসী বললে, না, না। রাত হয়েছে শুয়ে পড়।

মাটি ওর পাশে নিজের জায়গাটিতে গিয়ে শুয়ে পড়ল।

একটু পরে মাসী ডাকলে, ঘুমুলি নাকি ?

—না। কেন ?

—একটা কথা বলছিলাম।

—বল।

—তোর বিয়েটা দেখে যাবার ইচ্ছে ছিল। তা বুঝি আর হয় না।

মাটি হেসে উঠল: হঠাৎ আমার বিয়ের জন্যে তাড়া দিতে লাগলে কেন ?

মাসী বললে, তাড়া দিতাম না। কিন্তু শরীরটা ভালো বোধ করছি না। একটু তাড়াতাড়ি কর। কত দিন ধরে এই রকম চলছে বল দিকি ?

একটু ভেবে মাটি সত্যি কথাই বললে। বললে, তাড়া আমি দিচ্ছি মাসী। কিন্তু ওর একটু অসুবিধা আছে।

—ওর কার ? হরেনের ?

—হুঁ।

—গণেশ কি বলে ?

—জানি না।

ওর মন কোন দিকে মাসী বুঝলে। কিন্তু আর কিছু বললে না। শুধু তাড়াতাড়ি করবার জন্যে আবার একবার তাড়া দিলে।

নানা চিন্তায় মাটির ঘুম আসতে দেরি হয়েছিল। ঘুম ভাঙতেও দেরি হল উঠে দেখে মাসী নেই। নিশ্চয় কাজে বেরিয়েছে। হয়তো জ্বরটা ছেড়েছে, কি হয়তো সম্পূর্ণ ছাড়ে নি, একটু কমেছে মাত্র।

মাসীর কাণ্ডই এমনি।

সকালের দিকে গণেশ একবার করে আসে খোঁড়াতে খোঁড়াতে। আজ আর এল না। হয়তো কোনও কাজে আটকে পড়েছে।

পাঁচ বাড়ির কাজ সেরে মাসীর ফিরতে বেলা হয়। দিনের রান্নাটা মাটি রাঁধে। চা খেয়ে স্নান করে সে রান্না চড়াল।

দুপুর বেলায় মাসী এল ভিজে কাপড় সপ্‌সপ্‌ করতে করতে।

—তোমার আক্কেলটা কি মাসী!—ঝঙ্কার দিয়ে উঠল মাটি, কাল অত জ্বর, আর ভোরে উঠেই বেরিয়েছিলে কাজে!

—না গেলে ওদের কাজ করবে কে?

—তাই বলে তো আর জ্বর-গায়ে কাজ করে মানুষ মরতে পারে না!

—ওরে, মরা অত সোজা নয়। তোর রান্না হয়ে গেছে?

—কোন্‌কালে। কাল রাত্রে খাও নি। কাপড় ছেড়ে তাড়াতাড়ি খেতে বস দেখি!

—আর তুই খাবি নে?

—খাব বই কি। এক সঙ্গেই বসব।

খেয়ে-দেয়ে দু-জনেই একটু গা গড়ালে। কলে তিনটের জল আসতেই মাসী কাজে বেরুল। আর মাটি গা ধুয়ে পোশাকী-শাড়ি পরে হরেনের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল।

চারটে বাজল। পাঁচটা বাজল। ছটাও বেজে গেল। হরেনের দেখা নেই। তারও আবার জ্বর এল না কি? এমন তো করে না সে? অবশেষে হতাশ হয়ে শাড়ি ছেড়ে আবার একখানা আটপৌরে শাড়ি পরে মাটি রাত্রের রান্না চড়াল।

একটু পরে মাসী ফিরে এসে অবাক।

—বেরুস নি তুই?

মাসীর দিকে না চেয়েই মাটি জবাব দিলে, হ্যাঁ! তোমার শরীর খারাপ। বেরুব কোথায়?

—শরীর তো আজ আমার ভালোই আছে।

—তা হোক।

মাসী খুব খুশী হল। বোনঝির তাহলে মাসীর উপর টান আছে। দুদিন পড়ে থাকলে দেখবে।

অনেক রাত্রি পর্যন্ত দুজনে গল্প করে ঘুমিয়ে পড়ল।

তার পরের দিনও সকালে গণেশ এল না। চুলোয় যাক গণেশ, তার জন্যে তো তত নয়, কিন্তু বিকেলে হরেন না আসায় মাটি দস্তুরমত চিন্তিত হয়ে উঠল। মনে মনে স্থির করলে, কাল সকালে গণেশ আসবেই। তাকে পাঁচটা মিষ্টি কথা বলে একবার হরেনের খোঁজে পাঠাবে।

কিন্তু তার পরের দিনও কেউ এল না। না গণেশ, না হরেন। দুশ্চিন্তায় মাটির মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল।

গণেশ এল তার পরের দিন সকালে নয়, বিকেলে।

মাটি একা দাওয়ায় চুপ করে বসে ছিল। হরেনের দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে তার মাথা গোলমাল হয়ে গেছে। কী হল লোকটার? কোন কঠিন অসুখ-বিসুখ? না কি অন্য কোথাও ভিড়ে পড়ল? এই ক-দিন ভেবে ভেবে এমন হয়েছে যে, তার আর চিন্তা করবার ক্ষমতা পর্যন্ত নেই।

গণেশকে দেখে সে যেন বাঘিনীর মত ঝাঁপিয়ে উঠল: আচ্ছা লোক যা হোক! ক-দিন ধরে দেখা নেই, একটা খবর পর্যন্ত নেই।

হা হা করে হাসতে হাসতে গণেশ বললে, খবর দেব কি রে। যা ঝামেলায় পড়েছিলাম, দম নেবার ফুরসত ছিল না। ভাবছিলি বুঝি?

—ভাবব না? যে-মানুষ রোজ আসে, সে না এলে ভাবনা হবে না? কারও দেখা নেই—না তোমার না তার!

এইবার গণেশ লাঠিটা ঠেসিয়ে রেখে জুত করে বসল।

—হরেনের খবর জানিস না?

—কি করে জানব, এলে তবে তো?

—সে আর আসবে না।

—সে কি।

মাটির সমস্ত শরীরটা ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল।

নির্বিকার ভাবে গণেশ বললে, হ্যাঁ। সে গা-ঢাকা দিয়েছে।

ব্যাকুল কণ্ঠে মাটি চিৎকার করে উঠল: গা-ঢাকা কি গো! কোন ব্যামো-ট্যামো না কি?

—ব্যামোর বাবা! একটু চায়ের জল চড়া দিকি, বলছি।

মাটি খপ করে ওর একটা হাত চেপে ধরলে: না, তুমি আগে বল।

—ওই যে বললাম, গা-ঢাকা দিয়েছে। তার মানে জানিস?

—না।

—সেই যে বলেছিলাম না অনেক দিন আগে, ওর গতিক ভালো নয়? ঠিক তাই। যে কারখানায় ও কাজ করে, সেইখানকার বহু টাকা ভেঙেছে। মালিক পুলিসে খবর দিয়েছে। সুতরাং ও বেগতিক দেখে সরে পড়েছে।

—কোথায় গেছে?

মাটির গলা দিয়ে স্বর বেরুচ্ছে না।

—তা কি কেউ জানে! গণেশ হাসতে হাসতে জবাব দিলে—হয়তো কলকাতাতেই কোথাও লুকিয়ে আছে। নয়তো লম্বা পাড়ি দিয়েছে।

—কি হবে ?

—ধরতে পারলে জেল ; না ধরতে পারলে কাঁচকলা। মোট কথা, এদিকে আর আসতে হচ্ছে না বাছাধনকে। তার পর আমার ঝামেলাটা শোন।

ওর ঝামেলার কথা শোনবার জন্যে মাটি তো কাঁদছে।

মুখে বললে, বল।

—একটা জায়গা কিনলাম।

দু হাত দূরে বজ্রপাত হলেও মানুষ বোধ হয় এমন চমকে ওঠে না।

—জায়গা কিনলে! তুমি! কিসের জায়গা ?

—হ্যাঁ রে! আমি। লেখাপড়া করা, রেজেস্টারী করা, দু-বেলা উকিল-বাড়ি ছুটোছুটি করা—সে কি সোজা ঝামেলা ?

মাটির সমস্ত দেহ এবং বুকের ভিতরটা কি রকম করছিল। নিজেকে সামলাবার জন্যে তার একটু সময় এবং আড়াল দরকার হল। সে গণেশের দিকে পিছু ফিরে বসে চা তৈরির ব্যবস্থা করতে লাগল।

হরেন এবং গণেশ এত দিন ধরে এখানে আসা-যাওয়া করছে, কিন্তু ওরা যে কি করে মাটি জানে না। কিছু একটা করে নিশ্চয়ই। হরেন তো ভালোই কিছু একটা করে। নইলে এমন খরচ করে কি করে! আর ল্যাংড়া গণেশ, সেও যা হোক কিছু একটা করে। তেমন ভালো হয়তো নয়। ল্যাংড়া মানুষ ; তার খাটবার সামর্থ্য কোথায় ? হরেনের মত রোজগার সে নিশ্চয় করতে পারে না। করলে মাটির পিছনে সে-ও নিশ্চয় পাল্লা দিয়ে খরচ করার কসুর করত না।

সেই গণেশ বলছে কি না জায়গা কিনেছে, বাড়ি করবে! সে তো সোজা ব্যাপার নয় ? মাটির বিশ্বাস করতেই প্রবৃত্তি হল না। চাল মারছে হয়তো খোঁড়া।

কিন্তু চাল তো ও বড় একটা মারে না। সে মারত হরেন। লম্বা লম্বা চাল, লম্বা লম্বা কথা। গণেশ তো কুণ্ঠিত ভাবেই আসা-যাওয়া করে, দীন-দরিদ্র ভাবে থাকে। কিন্তু জমি কেনবার মত টাকা পেল কোথায় ? যে-কৌতূহল এতদিনের মধ্যে কোন দিন জাগে নি, সেই অদম্য কৌতূহল ওর স্নায়ু-শিরা পর্যন্ত চঞ্চল করে তুললে।

জানতে হবে, ব্যাপারটা কি। সত্য না মিথ্যা।

চায়ের পেয়ালা ওর সামনে নামিয়ে দিয়ে মাটি বললে, এমন মুশকিলে পড়েছিলাম মাসীকে নিয়ে!

—কি হয়েছিল ?

—জ্বর। মাসীকে কিছুতে কাবু করতে পারে না। জ্বরেও পারে নি, তাই নিয়েই সমানে কাজ করছে। কিন্তু অরুচিটায় ভারি কাবু করেছে। বুড়ো মানুষ, কিচ্ছু মুখে দিতে পারছে না। না খেয়ে ক-দিন বাঁচবে বল তো ?

বলবার কিছু ছিল না। গণেশ নিঃশব্দে চা খেতে লাগল।

মাটি বললে, কি রাঁধি বল তো ? তুমি তো ওস্তাদ লোক।

গম্ভীর স্বরে গণেশ বললে, বললে কি আর হয় রে ! রেঁধে দেখিয়ে দিতে হয়। কিন্তু···

মাটি যেন হাতে আকাশের চাঁদ পেলে, এমনি উৎফুল্ল হয়ে উঠল : সেদিন-কার মত রাঁধবে আজকে ? তোমার হাতের রান্না খেলে মাসীর নিশ্চয় মুখ ছেড়ে যাবে।

ঘাড় দুলিয়ে গণেশ বললে, মুখ ছেড়ে গেলে তো ভালোই। কিন্তু যদি মুখ ছোটে ! সাংঘাতিক কাণ্ড ! আমার ভয় তো মাসীর মুখকেই।

মাটি তাড়াতাড়ি বললে, মাসী আর কিছু বলে না তো। একেবারে সাড় নেই। কেমন ভয় হয়েছে, আর বেশি দিন বাঁচবে না।

—তাই নাকি !—লাঠিটা নিয়ে গণেশ উঠে দাঁড়াল—বাজারের থলিটা দে তা হলে। এলাম যখন, মাসীর মুখটা ছাড়িয়ে দিয়ে যাই !

রাঁধতে রাঁধতে দুজনে অনেক কথা হল।

—জায়গা কিনেছ, সত্যি ?

—কেন, বিশ্বেস হচ্ছে না ? দলিল দেখবি ?

—দলিল দেখে আর কি বুঝব ? কিন্তু বিশ্বেস হচ্ছে না সত্যি। অত টাকা তুমি পেলে কোথায় ? লটারীর টাকা পেয়েছ ?

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে গণেশ বললে, তাহলে তো ভালোই হত। কিন্তু খোঁড়া মানুষের কপালে কি আর লটারী জোটে রে ! খেটেই রোজগার করতে হয়েছে।

—এত টাকা, খোঁড়া মানুষ খাটতে পার না, কী করে রোজগার করলে তুমি ? কি কর তুমি ?

—সে আর একদিন বলব।

কৌতূহল ঠেলে উঠেছে ওর গলা পর্যন্ত। গণেশের একখানা হাত ধরে প্রচণ্ড বেগে নাড়া দিতে দিতে মাটি বললে, না। আজকেই বলতে হবে। এখুনি। বলবে না আমাকে ? ভয়টা কিসের ? খারাপ কাজ তো কিছু নয় ?

—না। খারাপ কাজ নয়।

—বিশ্বেস হচ্ছে না আমাকে?

—তোকে বিশ্বেস করি। সংসারে একমাত্র শুধু তোকেই বিশ্বাস করি। কিন্তু কি জানিস…

গণেশ তবুও দ্বিধা করতে লাগল। আর দুই-চোখে কৌতূহলের তীব্র জ্বালা নিয়ে মাটি একদৃষ্টে ওর দিকে চেয়ে। তার চোখে পলক পড়ছে না।

—কি জানিস, ব্যবসাটা ভালো। কিন্তু তেমন ইয়ে নয়, মানে…

—খুব খাটুনি?

খাটুনির নামে গণেশ দুই হাত ওর মুখের সামনে নেড়ে তীব্র প্রতিবাদ জানাতে লাগল: মোটেই না। খাটুনির চিহ্নমাত্র নেই। স্রেফ বসে থাকা। কি জানিস, গাছতলায় একখানা ছেঁড়া চট পেতে দশটা থেকে সাতটা পর্যন্ত স্রেফ বসে থাকা। এক পা নড়তে হয় না।

ভিক্ষা!

হরেন একদিন মাটিকে বলেছিল যেন, তোমার খোঁড়াটাকে দেখে এলাম, হাজরা রোডের মোড়ে ভিক্ষে করতে। মাটি বিশ্বাস করে নি। ভেবেছিল, কাকে দেখে গণেশ মনে করেছে হরেন। হরেন নিজেও অবশ্য খুব সুনিশ্চিত ছিল না। সন্ধ্যার আবছায়াতে দেখা। ভুল হওয়াও বিচিত্র নয়।

—জিজ্ঞাসা করলে, হাজরা রোডের মোড়ে?

—তুই দেখেছিস বুঝি কোন দিন?

—না। এমনি জিগ্যেস করছি।

—এক জায়গায় তো নয়। এক জায়গায় বেশি দিন বসতে নেই। নানান জায়গায় বসি।

—হুঁ।

কিন্তু গণেশের তখন বলার ঝোঁক চেপে গিয়েছে। আপন ঝোঁকে সে বলেই চলল:

—ব্যবসাটা ভালো। মূলধন লাগে না, খাটুনিও নেই। আয়ও মন্দ হয় না—গড়ে তিনটে টাকা রোজ। আর আমাকে তো জানিসই। আমি হরেন নই। চার-ছ গণ্ডার ওপর দিয়ে দিন চালাই। আর বাকিটা হাঁড়ির মধ্যে।

—হাঁড়ি!

হ্যাঁ। লোহার সিন্দুক কোথা পাব বল। মেঝেতে একটা হাঁড়ি পুঁতেছি। সন্ধ্যের ফিরে যা পাই ওরই মধ্যে ফেলে শিল চাপা দিই।

—কেউ চুরি করে না?

—টের পেলে তো। তা দেখ, জায়গা কিনতেই লাগল দু-হাজার টাকা।

মাটির চোখ কপালে উঠল : দু হা জা র!

—তার ওপর খোলার ঘর একখানা তুলতেও খরচ আছে।

মাটির মুখ দিয়ে কথা বেরুচ্ছে না। স্থির নেত্রে নির্বাক বিস্ময়ে সে ওর দিকে চেয়ে রইল।

রাত্রে শুয়ে মাসী জিজ্ঞাসা করলে, হ্যাঁ রে, হরেনের খবর পেলি?

—না।

খবর একটা মাটি পেয়েছে। কিন্তু আসল যে খবর, সে কোথায় আছে, কি করছে, সে খবর তো পায় নি।

উদ্বেগে মাসী উঠে বসল : না কী রে! খবর তো একটা নিতে হবে। এমন করে ঝুলিয়ে রাখবে ক-দ্দিন?

মাটি মাসীকে ফের বিছানায় শোয়ালে। গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে বললে, না। আর ঝোলাঝুলি নয় মাসী। যা হবার শীগ্‌গিরই হয়ে যাবে।

ছেঁদো কথায় ঝুনো মাসীকে ভোলান যায় না।

—কি করে হবে শুনি। যার সঙ্গে হবে, তারই তো পাত্তা নেই। সরে পড়ল কি না তাই বা কে জানে!

—তার পাত্তা—কিন্তু চট করে মাটি প্রসঙ্গটা ঘুরিয়ে নিয়ে বললে, জান মাসী, আজ দুপুরে যে এসেছিল, সে জায়গা কিনেছে।

—ওই খোঁড়াটা! জায়গা কিনেছে কী রে!

—হ্যাঁ। আমাকে দলিল দেখালে। দু-হাজার টাকা দিয়ে। এইবার বাড়ি তুলবে। মাটি দলিল দেখা সত্ত্বেও মাসী যেন ব্যাপারটা বিশ্বাস করতে পারছে না : কার কথা বলছিস আবোল-তাবোল।

—ওরই কথা মাসী। ওই খোঁড়াটার।

আনন্দে গৌরবে মাটির মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। কথাগুলো কেমন আধো-আধো হয়ে আসছে।

মাসী আবার উঠে বসল : আমি কিন্তু বাড়ি করা পর্যন্ত সবুর করতে পারব না বাপু!

—তার দরকার হবে না। কাল বরং তুমি কাজে বেরিয়ো না মাসী।

সকালেই আসবে; তখন কথাটা পাকা করে নিয়ো। ও সব আমি পারি না বাপু।

মাসী হেসে উঠল: তুই আবার পারবি কি? ও সব আমার কাজ, আমিই করব। তা, হ্যাঁরে ওর মত আছে তো?

—আছে।

হঠাৎ রাজ্যের লজ্জা যেন মাটিকে পেয়ে বসল। সে তাড়াতাড়ি পাশ ফিরে শুয়ে পড়ল।

মাসী আর কিছু বললে না। অন্ধকারে শুয়ে শুয়ে আপন মনে কত কি ভাবতে লাগল। তার অনেক দিনের অনেক সাধ-আকাঙ্ক্ষার কথা। মাটির পরলোকগত বাপ-মায়ের কথা। আরও কত কি।

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ এক সময় হেসে ফেললে।

বললে, খোঁড়াটা কিন্তু রাঁধে ভালো! না রে? মুখটা ছেড়ে গেছে।

মাটি সাড়া দিলে না। কিন্তু নিঃশ্বাসের শব্দে বোঝা যায়, তারও ঘুম আসছে না। মটকা মেরে পড়ে আছে! ওর লজ্জা দেখে মাসী মনে মনে আর এক প্রস্থ হাসলে।